কোলভা সৈকত - দক্ষিণ গোয়া - আলোকচিত্রী রত্নদীপ দাশগুপ্ত

~ **৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা** ~

শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৬

২০১১ সালে যখন আমরা দুজনে ' আমাদের ছুটি' ভ্রমণপত্রিকাটি আন্তর্জালে শুরু করি তখন এমন আ রকেটিও ভ্রমণপত্রিকার ওয়েবসাইট ছিলনা। আজকে ২০১৯ সালে একাধিক ই-ভ্রমণপত্রিকা তো হয়েইছে , এমন কী বিভিন্ন সাহিত্য বা শিশুদের পত্রিকার ওয়েবসাইটেও ' আমাদের ছুটি ' র আদলে ভ্রমণকাহিনি প্রকাশিত হচ্ছে। এই দেখে আমরা যারপরনাই আনন্দিত।

' আমাদের ছুটি' - র চলার পথে আমরা অনেক বন্ধু লাভ করেছি। তাঁদের কেউ কেউ নিজেদের অমূল্য সময়ের কিছুটা ' আমাদের ছুটি' - কে দিয়ে সাহায্যের হাতও বাড়িয়েছেন। কিন্তু সমস্যার বিষয় এটাই যে লেখা ও ছবি এডিট করার ক্ষেত্রে এবং প্রত্যেকবার ম্যাগাজিনটিকে 'কোডে' সাজিয়ে আপলোড করার জন্য আমরা আর কাউকেই পাইনি। ফলে আমাদের ব্যক্তিগত অসুবিধা ও অসুস্থতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে পত্রিকাটির প্রকাশ করা কখনও কখনও দুরূহ হয়ে পড়েছে। এযাবৎ পত্রিকা প্রকাশে সেভাবে দেরি না হলেও এই সংখ্যাটি প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার জন্য পাঠকদের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যদি আগ্রহ নিয়ে এইসব কাজের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে না আসেন তাহলে আমাদের দুজনের পক্ষে এই পত্রিকা আগামী দিনে নিয়মিত প্রকাশ করা বা আদৌ প্রকাশ করা কতদূর সম্ভব হবে তা জানিনা। অনেক লেখক-পাঠকই নিরাশ হচ্ছেন বুঝতে পারছি। তাঁদের জানাই , অনিয়মিতভাবে হলেও আমরা যতদিন সম্ভব পত্রিকাটি প্রকাশের চেষ্টা করে যাচ্ছি।

আপনারা পাশে থাকুন।

- **দময়ন্তী দাশগুপ্ত**

এই সংখ্যায় -

এক স্থূলকায় প্রৌঢ় ভদ্রলোক এতক্ষণ পেয়ালার মধ্যে গোঁফ ডুবিয়ে নিবিষ্টমনে চা পান কর্‌ছিলেন; এইবার পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে, ভরাগলায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন - "কল্‌কাতা থেকে ঐ সাইকেল ক'রে কাশ্মীর পর্যন্ত যাবে?"
"আজ্ঞে হ্যাঁ, আবার সাইকেলেই ফির্‌ব মনে কর্‌ছি।"
"ঘাড়ে এ ভূত চাপ্‌ল কেন?"

- শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়ের লেখনীতে "সাইকেলে কাশ্মীর ও আর্য্যাবর্ত্ত"র তৃতীয় পর্ব

চরৈবেতি

"আরেকটু এগোতে এল দেবপ্রয়াগ। আমাদের মধ্যে দেবজিৎ এই প্রথম আসছে উত্তরাখণ্ড। ওকে দেখে হিংসে হচ্ছিল। ও প্রথম দেবভূমির হাওয়া মাখছে। প্রথম দেখছে অনেক নীচের শ্যাওলা পড়া কাঠের জ্বালদেওয়া ধোঁয়া কুন্ডলি পাকিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে সবুজের গায়ে।"

অভিষেক ব্যানার্জির' কেদার ভ্রমণের বুকলেট-এর প্রথম পর্ব

~ আরশিনগর ~

পশ্চিম হুগলী– ঐতিহ্যের খোঁজে
– তপন পাল

~ সব পেয়েছির দেশ ~

চেনা-অচেনা হাম্পি – অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

বাংরিপোসির বৃত্তান্ত– সন্দীপ পাল

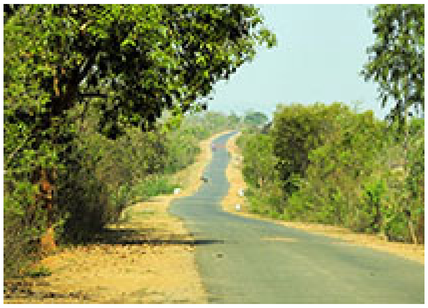

গোয়ায় বারবার– সুচন্দ্রিমা চৌধুরী

চমৎকার চৌকরি– অরিন্দম পাত্র

~ ভুবনডাঙা ~

গোঁসাইকুণ্ড ট্রেক– পল্লব চক্রবর্তী

রহস্যময় ডাইনোসর বিচ– মার্জিয়া লিপি

~ শেষ পাতা ~

ইচ্ছাপূরণের মুলকারখায়– গৌতম দে

মুকুটমণিপুরে – অংশুমান পাত্র

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.
For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 – 2020 AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বেড়ানোর মতই বইপড়ার আদতও বাঙালির চেনা সখ – তা ছাপা হোক বা ই-বুক। পুরোনো এই ভ্রমণ কাহিনিগুলির নস্টালজিয়া তাতে এনে দেয় একটা অন্যরকম আমেজ। আজকের ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি লেখক-পাঠকেরা অনেকেই শতাব্দীপ্রাচীন সেইসব লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পাননি। পুরোনো পত্রিকার পাতা থেকে অথবা পুরোনো বইয়ের নির্বাচিত কিছু অংশ তাই পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে 'আমাদের ছুটি'-র পাঠকদের জন্য।

['সাইকেলে কাশ্মীর ও আর্য্যাবর্ত্ত' –এই ভ্রমণকাহিনিটি ধারাবাহিকভাবে বেরোত প্রবাসী পত্রিকায় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। লেখক শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায় বিশেষ পরিচিত কোনও নাম নয়। আজকের ইন্টারনেট-গুগুল ম্যাপ-ইন্সটাগ্রাম-ফেসবুক লাইভ যুগের তরুণ-তরুণীদের জন্য এখানে রইল প্রায় একশো বছর আগের কয়েকজন অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় বাঙালি তরুণের ভ্রমণকথা।]

সাইকেলে কাশ্মীর ও আর্য্যাবর্ত্ত

শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়

পূর্বপ্রকাশিতের পর -

যুক্ত প্রদেশ

৩০শে সেপ্টেম্বর বুধবার - বেলা ৭ টার সময় রওনা হ'লাম। মাঠে গরু মহিষের দল বরাবর রাস্তার পাশে চর্‌ছে। কিন্তু দুধের জন্য আশেপাশের গ্রামে চেষ্টা ক'রে সামান্য দুধও জোটাতে পার্‌লাম না। কাজেকাজেই টিনের দুধ ও ছোলা খেয়ে প্রাতরাশ সেরে ফেল্‌লাম।

বেলা ১১।। টার সময় বিহারের সীমানা কর্ম্মনাশা নদীর পুল পার হ'লাম। যুক্ত-প্রদেশের রাস্তার বিশেষত্ব অল্পক্ষণ পরেই পাওয়া গেল। রাস্তা মাটির মত সাদা ও ধূলায় ভর্ত্তি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের কাপড়-চোপড় ও সাইকেলের চেহারা ধূলায় সাদা হয়ে গেল। আজ বেজায় গরম, হাওয়া বিপরীত দিক্ থেকে বইছে। ক্লান্ত হ'য়ে একটা গাছতলায় কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়ে নিলাম।

গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্ ছেড়ে বেলা ৫টার সময় মোগলসরাইয়ে এসে চা খাওয়া গেল। এখান থেকে বেনারস ৮ মাইল মাত্র। গঙ্গার ওপর ডাফ্রিন ব্রিজের ওপর দিয়ে রেলের লাইন ও দু'পাশে গাড়ী যাওয়ার রাস্তা। এই ব্রিজ পার হ'য়ে কাশী ষ্টেশনকে বাঁদিকে রেখে আমরা বেনারস সহরে ঠিক সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হ'লাম।

দশাশ্বমেধ-ঘাটের কাছে একটা রেঁস্তরায় ঢুকে পড়্‌লাম। রেঁস্তরাটি বাঙালী ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ। এক স্থুলকায় প্রৌঢ় ভদ্রলোক এতক্ষণ পেয়ালার মধ্যে গোঁফ ডুবিয়ে নিবিষ্টমনে চা পান কর্‌ছিলেন; এইবার পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে, ভরাগলায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন -
"কল্‌কাতা থেকে ঐ সাইকেল ক'রে কাশ্মীর পর্যন্ত যাবে?"
"আজ্ঞে হ্যাঁ, আবার সাইকেলেই ফির্‌ব মনে কর্‌ছি।"
"ঘাড়ে এ ভূত চাপ্‌ল কেন?"
আমরা বল্‌লাম, "দেখুন ইউরোপীয়েরা কি না কর্‌ছে! তারা দেশ দেশান্তর থেকে আমাদের দেশে এসে এভারেষ্টে উঠ্‌ছে - "
"ওসব সাহেবসুবোদেরই পোষায়,বাঙ্গালীর ছেলে একি খেয়াল বাপু! চেহারাও ত দেখ্‌ছি সে রকম নয় - শেষে হার্টফেল্ না করে। কাশী অবধি এসেছ বেশ হয়েছে, এইবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।" আমরা তাঁর দিকে আর মনঃসংযোগ না করে খেতে আরম্ভ ক'রে দিলাম।

সে রাত্রের মতো লাক্‌সায় রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে উঠে পড়্‌লাম। এখানের সেবা-আশ্রমটি মিশনের অন্যান্য সকল জায়গার সেবাশ্রম

অপেক্ষা বড় ও বন্দোবস্ত বেশ সুন্দর। এখানে যথেষ্ট জল পাওয়া গেল,সমস্ত দিনের রোদ ও ধূলো ভোগের পর স্নান ক'রে বেশ চাঙ্গা হ'য়ে উঠলাম।
আজ ৬২ মাইল এসেছি - কল্‌কাতা থেকে মোট ৪৩৯ মাইল।

১ লা অক্টোবর বৃহস্পতিবার সকালে উঠে নাগোয়ায় এলাম। হোষ্টেলের ছাত্রেরা আমাদের দেখে খুব আনন্দিত হলেন। সাইকেল পরিষ্কার ও অল্পস্বল্প যে মেরামত করা দর্কার হ'য়ে পড়েছিল এখানে তা সেরে নেওয়া গেল। সুখের বিষয় এ পর্য্যন্ত টায়ার বা টিউব আমাদের কোনো কষ্ট দেয়নি।
বিকাল বেলায় সহরের দিকে কতগুলি দর্কারী জিনিষপত্র কেন্‌বার জন্যে বার হ'লাম। রাস্তায় বেজায় ধূলো, পুরাণ ধরণের বাড়ী ও গলিঘুঁজি প্রচুর। সহরে বাঙালীর অভাব নেই। রামলীলার জন্য রাস্তায় ভিড় যথেষ্ট। এখান থেকে চা দুধ প্রভৃতি কিনে হোষ্টেলে ফিরে আস্‌তে রাত ১০টা বেজে গেল। হোষ্টেলে কাশ্মীরের চীফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ললিত বসু মহাশয়ের পুত্রে সঙ্গে আলাপ হ'ল। কাশ্মীর-যাত্রী শুনে ইনি শ্রীনগরে তাঁদের বাড়ীতে অতিথি হবার জন্যে আমাদের নিমন্ত্রণ কর্‌লেন।

২রা অক্টোবর শুক্রবার ভোরের আলোয় ইউনিভার্সিটীর সারি সারি বাড়ীগুলি ঘুমন্ত পুরীর মতোই নিঝুম। চারপাশের সবুজ মাঠের ভিতর দিয়ে লাল কাঁকরের সোজা সোজা রাস্তা। ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং ভারতীয় স্থাপত্যকলার অনুকরণে তৈরী ব'লে মনে হয় যেন প্রাচীন যুগের কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পড়েছি।

এখান থেকে একটি রাস্তা জোয়ানপুর ও প্রতাপগড় হ'য়ে এলাহাবাদে গেছে। রাস্তা ভাল, এলাহাবাদ প্রবেশ করার জন্যে গঙ্গার ওপর ও.আর.আর এর ব্রিজ (কার্জ্জন ব্রীজ) আছে। পুলের নীচের তলায় রেল-লাইন ও ওপর দিয়ে গাড়ী ঘোড়া লোকজন পার হয়। কিন্তু এলাহাবাদ এ পথে প্রায় ১০০ মাইলের ধাক্কা। এই রাস্তা দিয়ে রায়বেরিলি হ'য়ে লক্ষ্ণৌ যাওয়া যায়,দ্বিতীয়টি গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড। এ পথ মোগলসরাই থেকে সোজা এলাহাবাদ গেছে যমুনা ব্রিজ পার হ'য়ে। এ পুলটিও দ্বিতল,উপরে রেলের লাইন, নীচের পথটি গাড়ী ঘোড়া ও লোকজনের জন্যে। আমরা জোয়ানপুর-প্রতাপগড়ের রাস্তা ছেড়ে ও গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরার জন্যে মোগলসরাইয়ে ফিরে না গিয়ে ঝুঁসীর পথে এলাহাবাদ অভিমুখে চল্‌লাম। সহর থেকে বার হ'য়ে বি.এন.ডব্লিউ লাইন পার হ'বার পরই একটা গাড়ীর ফ্রি হুইলের স্প্রিং কেটে গেল। যন্ত্রপাতি বার ক'রে সার্‌তে প্রায় আধ ঘন্টা সময় লাগ্‌ল।

আজ খুব জোরে বাতাস বইছে। পথ ট্রাঙ্করোডের মতোই চওড়া,তবে বেজায় ধূলো - এটা বোধ হয় যুক্তপ্রদেশের রাস্তার বিশেষত্ব। পাশের ক্ষেতে হিন্দুস্থানী চাষা,গায়ে পাঞ্জাবী,চাষ কর্‌ছে, পিছনে ঘাঘরা-পরা মেয়েরা বোধ হয় বীজ ছড়িয়ে চলেছে। এখানকার মেয়েদের শাড়ী পরার রেওয়াজ নেই। হিন্দুরা পরে ঘাঘরা ও মুসলমান মেয়েরা পায়জামা। আর একটা জিনিস বেজায় চোখে ঠেকে সেটা হচ্ছে সাদা রংয়ের গাধা। পাশের গাছে বাঁদরদের সভার কিচির মিচির শব্দ আর রাস্তার কাঠবিড়ালীদের ছুটাছুটি আজকের পথের একঘেয়েমি দূর করেছে।

দুপুর বেলা গোপীগঞ্জে নামা গেল। একটি ছোটখাট সহর। পথের ধারে ধারে বড় বড় পুকুরের মাঝখানে একটি করে লম্বা ত্রিশূল বার হয়ে আছে। আর পুকুরের ধারে ধারে শিব-মন্দির। এই রকম একটা পুকুরের ধারে বটগাছের তলায় কয়েক ঘন্টার জন্যে আমরা আড্ডা ফেল্‌লাম। পুকুরে স্নান ক'রে বাজারের পুরী খেয়ে পেট ভরান গেল। এখান থেকে সোজা জোয়ানপুরে যাবার পথ আছে।
রওনা হ'তে বেলা ৪টা বাজ্‌ল। রোদের তেজ ও হাওয়ার জোরের জন্যে আমরা বেশী এগোতে পার্‌ছি না। ঝুঁসী পৌঁছতে প্রায় রাত ৯টা বাজ্‌ল। পথটি গঙ্গার ধারে একটি পন্টুন ব্রীজের সাম্‌নে এসে শেষ হ'য়ে গেছে। অক্টোবরের শেষ বরাবর থেকে মে মাসের শেষ অবধি এই পুল দিয়ে পার হবার বন্দোবস্ত থাকে। বাকী সময় পাছে বর্ষার স্রোতে পুল ভেসে আয় এইজন্যে পুল খোলা থাকে। রাত বেশী হ'য়ে যাওয়ায় ফেরী পাওয়া গেল না। অগত্যা কোনো উপায় না দেখে বি, এন, ডব্লিউ রেলের পুল দিয়ে পার হ'বার কথা হ'ল। ঝুঁসীর মিলের বিজলী বাতি দেওয়া রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকে অনেক খানা, ডোবা, নালা, ঝোঁপঝাঁপ পার হ'য়ে প্রায় মাইল খানেক যাবার পর লাইনের উঁচু বাঁধের ওপর অতি কষ্টে উঠলাম। পুলের ওপর দিয়ে সাইকেল নিয়ে যাওয়া এক বিষম ব্যাপার! তিন চার হাত পর পর প্রায় আট দশ ইঞ্চি উঁচু লোহার কড়ি বরাবর লাইনের দু'পাশে বার হ'য়ে আছে। এর ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। পথটি হাত তিনেক চওড়া,পাশে মাত্র দু'টি তার রেলিঙের কাজ কর্‌ছে। সাইকেল কাঁধে নিয়ে আস্তে আস্তে চল্‌লাম। লোহার পাতে আমাদের জুতো মাঝে মাঝে পিছলে যেতে লাগ্‌ল। সাইকেল শুদ্ধ নীচে গঙ্গায় পড়া বিশেষ বাঞ্ছনীয় হবে না ব'লে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লাম। পুল আর শেষ হয় না,কেবল জ্যোৎস্না ছিল ব'লে কোন দুর্ঘটনা ঘট্‌ল না।

সম্মুখেই ষ্টেসনের মিটিমিটি আলো জ্বল্‌ছে। প্রায় ত্রিশ ফুট নীচে এলাহাবাদ সহরতলীর রাস্তা। ষ্টেসন দিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত হ'বে না ভেবে এইখান থেকেই নীচে নাম্‌বার চেষ্টা দেখতে লাগ্‌লাম। লগলাইন দড়ি লগেজ খুলে বার ক'রে তার সাহায্যে একে একে সাইকেলগুলিকে বেঁধে ঝুলিয়ে নীচে নামান হ'ল। এতেও নিস্কৃতি নেই, নীচে শালের খুঁটীর বেড়া। কোনো রকমে বেড়া টপ্‌কে রাস্তায় এসে হাঁপ ছাড়লাম। চারদিকে অল্প অল্প কুয়াসা। ঘামে-ভেজা জামা গায়ে থাকায় এখন শীত শীত কর্‌তে লাগ্‌ল। রাত প্রায় এগারটা। পুল পার হ'য়ে রাস্তায় আস্‌তে দেড় ঘন্টার ওপর লেগেছে। মাইল দুই আসার পর এলাহাবাদ সহরের মধ্যে পৌঁছলাম। সব দোকান পাট বন্ধ, সহর নিস্তব্ধ। ঘোরাঘুরি কর্‌তে কর্‌তে একটা কাশ্মিরী হোটের খোলা দেখে সেইখানেই ঢুকে পড়্‌লাম।
আজ ৭৪ মাইল বাইক করা গেছে। মিটারে দেখা গেল কল্‌কাতা থেকে মোট ৫১৩ মাইল এসেছি।

৩রা অক্টোবর,শনিবার - ডাঃ নীলরতন ধর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যে সকালে উঠে আমরা কর্ণেলগঞ্জের দিকে রওনা হ'য়ে পড়্‌লাম। তিনি আমাদের দেখে ভারী খুসী হলেন ও তাঁর বাড়ীতে থাকার জন্যে অনুরোধ কর্‌লেন। হোটেলের পাওনা মিটিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে ফির্‌তে বেলা হ'য়ে গেল। ধূলোয় সাইকেলগুলির অবস্থা এমন হয়েছে যে রীতিমত পরিষ্কার না কর্‌লে আর তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা দুষ্কর।
ইউনিভার্সিটী,হাইকোর্ট প্রভৃতি দেখ্‌তে দেখ্‌তেই সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। রাস্তায় ট্রাম বা ট্যাক্সির চলন নেই,আছে কেবল টোঙ্গা - এক্কার উন্নত সংস্করণ। এক্কার মতো চারদিকে লোক না ব'সে কেবল সাম্‌নে পিছনে দু'জন দু'জন ক'রে বস্‌তে পারে। এখানে ইতর ভদ্র

সকলেরই যান টোঙ্গা ও এক্কা। চাঁদনি রাত - রাস্তায় আলোর বালাই নেই। জিজ্ঞেস ক'রে জানা গেল কৃষ্ণপক্ষ ছাড়া অন্য সময়ে এখানে রাস্তায় আলো জ্বালা হয় না।

৪ঠা অক্টোবর রবিবার - খুব ভোরে বেরিয়ে পড়্‌লাম। ফোর্ট ও যমুনার দ্বিতল পুলের ওপর থেকে গঙ্গাযমুনা সঙ্গম দেখে আবার গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক্ রোড ধর্‌লাম। মাইল ছয় অতি খারাপ রাস্তা, বেজায় ধূলো। এইখানে রাস্তার বাঁদিকে বামরুল্লা এয়ারডোমে যাবার পথ। কিছুদূর থেকে ভাল রাস্তা পাওয়া গেল। পাশে পাশে বরাবর গম, ভুট্টা ও জোয়ারের ক্ষেত, মাঝে মাঝে দু'একটা ধানের ক্ষেতও আছে। পথের ধারে ধারে শুক্‌নো ডোবায় কাদাখোঁচা, কাক, সারস প্রভৃতি অনেক রকম পাখী দেখা যাচ্ছে। আম জাম নিম গাছের সারি রাস্তার দু'পাশে চলেছে। তারি ছায়ায় ছায়ায় চ'লে আমরা দুপুরবেলায় খাগোয়া চটীতে, বড় পুকুরের ধারে এক বাগানের মধ্যে আড্ডা ফেল্‌লাম।

এখানে একটা ভারি মজার ঘটনা হয়েছিল। বাগানের মধ্যে দলে দলে বাঁদরের সভা ব'সে গেছে। পুকুরে স্নান ক'রে ফির্‌ছি, দেখ্‌লাম সাম্‌নেই এক 'পালের গোদা' আমাদের এক টুপি মাথায় পরে, একটু আগে আমরা যে রকম ভাবে গাছে ঠেস দিয়ে বসেছিলাম ঠিক সেইভাবে আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। এই রোদে টুপি না থাক্‌লে যে কি বিপদে পড়্‌তে হবে সে আর বুঝ্‌তে বাকী রইল না। তাড়া দিতেই টুপীপড়া বাঁদরটি লাফ মেরে গাছে উঠ্‌ল, টুপিটা মাথা থেকে পড়ে গেল। আমরাও বাঁচলাম। এবার থেকে আমরা সাবধান হ'য়ে গেলাম। পাহারার বন্দোবস্ত না ক'রে জিনিষপত্র ফেলে আর কোথাও যেতাম না।

আমাদের দেশের তুলনায় এখানকার গরু ছাগল খুব বড়। রাস্তার পাশে মন্দির ও মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে। ঘন্টা বাজিয়ে দুল্‌কি চালে সারি সারি উটের দল চলেছে। তাদের পায়ের ধূলোয় পিছনের রাস্তা অন্ধকার। খোঁজ নিয়ে জান্‌লাম দিনাজপুরের মেলায় বিক্রীর জন্য এদের নিয়ে যাচ্ছে।

বেলা পাঁচটার পর ফতেপুরে। ছোট খাট সহর। বাজনা বাজিয়ে নিশান উড়িয়ে একটা শোভাযাত্রা চলেছে। ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে ডাকবাংলায় গিয়ে উঠ্‌লাম। বাংলায় ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদের সাদর অভ্যর্থনা কর্‌লেন। রাত্রে এখানকার ওভারসিয়ার শ্রীযুত দেবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করা গেল। ফতেপুরে ইনিই একমাত্র বাঙালী। এখান থেকে ডান দিকে রায়বেরিলি ও বাঁদিক্ দিয়ে গাজীপুরে যাওয়ার রাস্তা দেখা গেল।
এলাহাবাদ থেকে আজ ৮০ মাইল আসা হয়েছে, রাস্তা মোট ৫৯৩ মাইল উঠেছে।

৫ই অক্টোবর সোমবার। কানপুরের পথে মোহার ব'লে একটা ছোট গ্রাম আছে। এখানে গাছে গাছে অসংখ্য পাখী দেখা যাচ্ছে। কাঁক, কাস্তেরো, কাদাখোঁচা, মাণিকজোড় সবই শিকারের পাখী। সঙ্গে বন্দুক না থাকার জন্যে বড় আপ্‌শোষ হচ্ছিল। ফতেপুর থেকে ৩৫ মাইল ও কলকাতা থেকে ঠিক ৬২৮ মাইল আসার পর একটা ষ্টাণ্ডার্ড গাড়ীর পিছনের চাকায় ফুটো (puncture) হ'ল। এই প্রথম puncture। আজ রাস্তা বেজায় খারাপ - গাড়ীর ধাক্কার (jolting ও jerking) জন্যে গায়ে হাতে ব্যথা হ'য়ে গেল। বেলা দেড়টার পর আমরা কাণপুর সহরতলীতে এসে পড়লাম। পাশে পাশে মিল ও মিলের রেল-লাইন আর তার পাশে পাশে বস্তি। কাণপুরে প্রথম ট্রাম দেখা গেল, কলকাতার তুলনায় বেজায় ছোট ও নেহাৎই যেন কেমন-কেমন।

যুক্ত-প্রদেশের মধ্যে কানপুর সব-চেয়ে বড় ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। সিপাহী বিদ্রোহের জন্যে কানপুর প্রসিদ্ধি লাভ করেছে বটে, কিন্তু কানপুরের কলকারখানা, বাজারে নানাপ্রকার ফসলের আমদানী-রপ্তানী ও লোকজনের ব্যস্ত-সমস্ত ভাব সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইসবই আধুনিক কানপুরের প্রসিদ্ধি ও সমৃদ্ধি লাভের কারণ। কানপুর থেকে রাস্তার বাঁদিকে ঝান্সী ও ডান দিকে লক্ষ্ণৌ যাওয়ার রাস্তা।
মিটারে ৬৪০ মাইল উঠেছে। সুতরাং আজ আমরা মোটে ৪৭ মাইল এসেছি।

৬ই অক্টোবর মঙ্গলবার। সকাল থেকেই মেঘ ক'রে রয়েছে। দিনটা বেশ ঠাণ্ডা। বি-বি,সি-আই রেল লাইন,পাশে পাশে রাস্তার সঙ্গে চলেছে। এক পাশে একটা বড় সর্‌কারী কৃষিক্ষেত্র দেখা গেল। ইসান রেল ও রাস্তার পুল পার হ'য়ে সূরযপুর গ্রাম। মাইল পঞ্চাশ আসার পর একটি রাস্তা ট্রাঙ্ক রোড থেকে ডান দিকে চ'লে গেছে। মোড়ের পথ নির্দ্দেশক কাষ্ঠফলক, ডান দিকের রাস্তাটি দিল্লী দিয়া ও সোজা রাস্তাটি কনোজের দিকে গেছে, দেখাচ্ছে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এপর্য্যন্ত কোথাও এরকম হঠাৎ মোড় ফেরেনি। সেইজন্য আমাদের এখানে একটু সন্দেহ হ'ল। দূরে ডানদিকের রাস্তা থেকে একটা এক্কা আস্‌তে দেখে তার কাছ থেকে সঠিক খবর পাব এই আশায় আমরা সেইখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লাম।

এক্কার ভেতর থেকে একটি প্রৌঢ় হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক (পরে অবগত হলাম তিনি পুলিশের লোক) মুখ বার ক'রে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন দেখতে পেলাম। একটু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম -
"দিল্লীর রাস্তা কোন্‌টি বল্‌তে পারেন?"
গম্ভীর ভাবে উত্তর হ'ল - "সোজা যাও।"

সুতরাং দেখলাম কাষ্ঠফলকে ভুল নিশানা দেখাচ্ছিল। কিন্তু পাঠকগণের স্বভাবতই কৌতূহল হ'তে পারে যে, রাস্তায় এরকম ভুল নিশানা থাক্‌বার কারণ কি। এইরকম ভুল নিশানার জন্যে রাস্তা-বিভ্রাট পরেও আমাদের হয়েছিল। এর কারণ আর কিছু নয়; সাধারণতঃ রাস্তার এইরূপ মোড়ে যে-সব নিশান-ফলক থাকে,সেগুলি প্রায়ই তেমন মজবুত ও দৃঢ়ভাবে মাটির সঙ্গে গাঁথা থাকে না। কাজেই একটু বেশী ঝড়-হ'লে বৃষ্টি বা চলন্ত গরুর গাড়ীর সামান্য একটু ধাক্কা লাগ্‌লেই নিশান-ফলকগুলি ভূমিসাৎ হয়। তারপর যথাসময়ে সর্‌কারী কুলীরা যখন রাস্তা মেরামত কর্‌তে আসে তখন তারা পুনরায় নিশান-ফলকটিকে কোনো রকমে দাঁড় করিয়ে দেয়। তখন নিশান-ফলকটি উল্‌টা-পাল্‌টা হ'য়ে যায়। তারা ইংরাজীতে লেখা ফলকের দিক-নির্দ্দেশ কিছুই বোঝে না। সুতরাং বিদেশী পথিককে রাস্তা হারাতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না।

খানিক দূর গিয়ে একটা ছোট গ্রামের ধারে চা তৈরী কর্‌বার জন্যে নেমে পড়্‌লাম। গ্রামের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি

আমাদের কয়েক প্যাকেট চা উপহার দিলেন। রাস্তার ওপরে এঁর আতর ও গোলাপ-জলের প্রকাণ্ড কার্‌খানা। গ্রামের পাশের এক রাস্তা দিয়ে কনোজ মাত্র এক মাইল দূর। এ সুযোগ ছাড়া উচিত মনে হ'ল না। সোজা কনোজে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। কনোজ এখন একখানি গ্রাম মাত্র। জয়চাঁদের দুর্গ প্রায় দেড়শত ফিট উঁচু মাটীর স্তূপ - উপরে এখন ভুট্টার চাষ হচ্ছে। দুর্গের স্মৃতিস্বরূপ এক পাশে একটি থামের ভগ্নাবশেষ মাত্র এখন দেখা যায় প্রাচীনযুগের নিদর্শন হিসাবে এইখান থেকে একটা লতাপাতাকাটা ছোট ইট সংগ্রহ ক'রে নিলাম। এরই পাশে একটি বড় সুন্দর ও পুরানো মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল।
সূর্য্য অস্ত যায়-যায়। গুরসাহীগঞ্জ আর কয়েক মাইল দূর। সেইখানেই আজ রাত্রের মতো ছাউনি পড়্‌বে। পালে পালে গরু মহিষ মাঠ থেকে ফির্‌ছে। গোধূলি-বেলায় অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু যেন 'গোধূলিতে' আরও ম্লান হ'য়ে গেছে। সমস্ত 'গো-ধূলি' শরীরে ও কাপড়-চোপড়ে সঞ্চয় ক'রে আমরা গুরসাহীগঞ্জে এসে পৌঁছলাম। এখান থেকে একটি রাস্তা ডানদিকে ফতেগড় অভিমুখে গেছে।

গুরসাহীগঞ্জ বি-বি,সি-আই রেলের একটি ছোট ষ্টেশন। রাস্তার দু'পাশে কয়েকটি দোকান ও বাড়ী নিয়ে গ্রামটি তৈরী হ'য়েছে। সুবিধা মতো থাক্‌বার জায়গা না পেয়ে প্রথমে ষ্টেশন-মাষ্টার মশায়ের কাছে দর্‌বার করা গেল;সুবিধা কর্‌তে পার্‌লাম না। শুন্‌লাম একটি ধর্ম্মশালা এখানে আছে, অগত্যা সেইখানেই যাওয়া গেল।

যুক্ত-প্রদেশের মতো আচার-ব্যবহারের গোঁড়ামি আর আমরা কোথাও দেখিনি। এখানে কূয়া থেকে জল তোল্‌বার বালতি হিন্দু ও মুসলমানদের আলাদা আলাদা। ভুলক্রমে যদি কোনো মুসলমান হিন্দুদের 'ডৌল' ছোঁয় তা হ'লে সেখানে রীতিমত এক দাঙ্গা বেধে ওঠ্‌বার জোগাড় হয়। দৈবাৎ যদি কোনো বিদেশী, মুসলমানের কাছ থেকে খাবার জিনিষ-পত্র কেনে তবে পরে হিন্দুদের কাছ থেকে তার কোনো কিছু কিন্‌তে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। হিন্দু হ'য়ে জুতা প'রে জল খাওয়া ও মাথায় 'সাহেবী টোপ' পরার উদ্দেশ্য যে কি তা কিছুতেই বোঝাতে পারি-নি। মুসলমানেরা কাচের বাসন ব্যবহার করে ব'লে চায়ের এনামেলের মগ-গুলিও আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল।

সুতরাং ধর্ম্মশালায় আর আমাদের স্থান হ'ল না। অনেক কষ্টে ধর্ম্মশালার বাইরের রোয়াকে থাক্‌বার 'অনুমতি' জোগাড় কর্‌লাম। এক কনোজীয়া ব্রাহ্মণের দোকান থেকে পুরী, মাংস কিনে রাতের মতো খাওয়া শেষ করা গেল। কনোজীয়াদের গোঁড়ামি কিছু কম, এরা বাঙ্গালীদের মতো মাছ-মাংস সবই খায়।
সব সাইকেলগুলিকে এক-সঙ্গে চাবি দিয়ে আমরা সতর্ক হ'য়ে শুয়ে পড়্‌লাম। আজ ৬৫ মাইল আসা হয়েছে। কলকাতা থেকে এখানকার দূরত্ব ৭০৫ মাইল।

৭ই অক্টোবর বুধবার। আজকে রাস্তার প্রথমে দুপাশে ভুট্টা জনারের ক্ষেত; কদাচিৎ দু'একটা ধানের ক্ষেতও আছে। কূয়ার গভীরতা বড় বেশী ব'লে বলদের সাহায্যে জল তুলে এরা ক্ষেতে ফসল তৈরী করে। এখানকার চাষী বাংলার মতো অদৃষ্টবাদী নয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই দেখ্‌লাম, কোথাও কোথাও পুকুরে পাট পচান ও আছড়ান হচ্ছে। উটে-টানা দ্বিতল গাড়ী সারি দিয়ে চলেছে। গাড়ীর চেয়ে তাকে খাঁচা বল্‌লেই ভাল হয় - একটি দ্বিতল খাঁচা গরাদে দেওয়া তলায় চারটি ছোট ছোট চাপে। পাশে হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড মাঠ দেখা গেল যেন সবুজ মখমলে মোড়া। এঅঞ্চলে এরকম মাঠ প্রায়ই দেখা যায়। এগুলিকে এন্‌ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড বলে। এখানে সর্‌কারী কর্ম্মচারীরা সফরে এসে ছাউনি ফেলে থাকেন।

দুপুরের পর বেওয়ার ব'লে একটা বড় গ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা এটা-র দিকে সাইকেল চালিয়ে দিলাম। বেওয়ার থেকে ডান দিকে ফতেগড় ও বাঁদিকে এটোয়া যাবার পথ। চারিদিকের দৃশ্য যেন হঠাৎ বদ্‌লে গেল। এখানে রাস্তার পাশে পাশে বড় বড় elephant grass কয়েক মাইল ধ'রে চলেছে। একদল হরিণ হঠাৎ রাস্তার একপাশ থেকে বেরিয়ে আমাদের সাইকেলের সুমুখ দিয়ে ছুটে বড় বড় ঘাসের বনের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। এক দলের পর আর-এক দল এম্‌নি পালে পালে কৃষ্ণসার কখন বা ছোট চিতল হরিণের দল দেখা যেতে লাগ্‌ল। টিয়ার ঝাঁক মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, বিচিত্র কলরব কর্‌তে কর্‌তে। পথে কেবল হরিণের পাল আর টীয়ার ঝাঁক - যেন আমরা এদেরই রাজত্বে এসে পড়েছি!
প্রায় বেলা তিনটার সময় ভনগাঁওয়ে উপস্থিত হ'লাম। এখান থেকে বাঁদিকে সিকোহাবাদ হ'য়ে আগ্রার পথ চ'লে গেছে। দূর মোট ৭৫ মাইল। ডান দিকে ফতেগড় যাবার রাস্তা।

অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম ছটায় মাঠ পথ লাল হ'য়ে গেছে। ক্রমশঃ অন্ধকার পৃথিবীকে ছেয়ে ফেল্‌লে। পর পর তিনটি খাল (Lower Ganges Canal) পার হ'য়ে আমরা আলো জ্বেলে চলেছি। কর্ম্ম-কোলাহল-রত ভারাক্রান্ত ধরিত্রী এখন নিস্তব্ধ, স্থির! অন্ধকারের বুক চিরে' একটা আলোর রেখা আমাদের সাম্‌নে এসে পড়্‌ল। উৎসাহে এগিয়ে চল্‌লাম, মনে হ'ল আজকের মতো পথের শেষে এসে পড়েছি। সমস্ত দিনের রোদ,তৃষ্ণা ও এই পরিশ্রমের পর - আঃ সে কি আরাম!
বাজনা ও লোকজনের গোলমাল কানে এল - ভাবলাম বোধ হয় সহরে কোনো কারণে মিছিল বেরিয়ে থাক্‌বে। পাঞ্চ-লাইট্-দেওয়া চৌমাথায় এসে দেখি পাশের মাঠেই সিনেমা ব'সে গেছে। এদের ঐক্যতান-বাজনার হট্টগোল আমরা অনেক দূর থেকে শুন্‌তে পাচ্ছিলাম। তা হ'লে এটায় এসে পড়েছি! এইবার থাক্‌বার জায়গার বন্দোবস্ত কর্‌তে পার্‌লেই আজকের মতো নিশ্চিন্ত। বাঁদিকে বড় বড় অনেক হাঁসপাতালের কোয়ার্টার্‌স্ খালি রয়েছে দেখা গেল। এরই যে-কোনো একটা বারান্দায় আমাদের বেশ চ'লে যেতে পারে। হাঁসপাতালের 'বড় ডাক্তার সাহেবের' কাছে যাওয়া গেল অনুমতি চাইবার জন্যে। হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের কাছে বাঙালী ব'লে পরিচয় দিতেই তিনি সোজা পথ দেখিয়ে দিলেন বাইরের দিকে। আমরা আর-এক রকম অভিজ্ঞতা লাভ কর্‌লাম। উপায় না দেখে অগত্যা একবার পুলিসের কাছে ভাগ্য পরীক্ষা কর্‌বার জন্যে থানার দিকে রওনা হ'লাম।
থানায় মামুলি পরিচয় দিতে খানিক্ষণ গেল। এই একটা কাজ যা ক্রমশঃই বিরক্তিকর হ'য়ে দাঁড়াচ্ছিল। প্রথমতঃ আমাদের আদ্যোপান্ত বিবরণ! হয়ত প্রত্যেক দিন কম ক'রে পাঁচ-সাত বার দিতে হয়, তার ওপরে উপর্য্যুপরি সম্ভব অসম্ভব নানা-প্রকারের প্রশ্ন! যাই হোক এখানকার ইন্‌স্‌পেক্টার্ সাহেব বেশ ভদ্রলোক। ইনি আমাদের জন্য ঘর, 'চারপাই', স্নানের জন্যে জল প্রভৃতির বন্দোবস্তও ক'রে দিয়েছিলেনই, উপরন্তু তাঁর অনুগ্রহে ফাই-ফরমাস শোন্‌বার একটা চাকরও সে-রাতের মতো আমরা পেয়ে গেলুম। এ অবস্থায় একটি অনুগত ভৃত্য লাভ আমাদের পক্ষে বড় কম সৌভাগ্যের কথা নয়। বাজার থেকে খাবার আনিয়ে বিছানায় ব'সে খাওয়া হ'ল। বিছানা পাতা, সাইকেল পরিষ্কার, জিনিসপত্রের ধূলা ঝাড়া এইসব কাজ আমাদের আর কর্‌তে হ'ল না।

চাকরের দ্বারাই সব সারা গেল। আজ ৭৯ মাইল আসা হয়েছে,কলকাতা থেকে দূরত্ব মোট ৭৮৪ মাইল।

৮ই অক্টোবার বৃহস্পতিবার - এটা, জেলার সদর। বেশ জায়গা, ওরই মধ্যে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু রেলওয়ে এখান থেকে দূর ব'লে জায়গাটা তেমন বিখ্যাত নয়। এটা থেকে ২০ মাইল দূরে সিকান্দ্রারাউয়ের রেল ষ্টেশন। এখান থেকে সিকান্দ্রারাউ অবধি মোটর লরী যাতায়াত করে। রাস্তার বাঁদিকে পর পর দু'টি রাস্তা দেখা গেল, একটি সিকোহাবাদ অপরটি মথুরা অভিমুখে গেছে। এই জেলায় চোর-ডাকাতের উৎপাত খুব বেশী, ক্রিমিন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট ব'লে এটার অখ্যাতি শোনা গেল।

সকালে রওনা হ'য়ে উল্লেখযোগ্য জিনিষ দেখ্‌ছি খইয়ের আড়ত। দোকানের সাম্‌নে চটের ওপর পাহাড়ের মত খই ঢালা হ'য়েছে, কেবল একজায়গায় নয়, রাস্তার দু'পাশেই এই রকম খইয়ের পাহাড়। আর দেখলাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গার্ডেন - ঘাসে-ঢাকা এক টুক্‌রো ছোট্ট বাগান আর তার মাঝখানে ভিক্টোরিয়ার মর্ম্মর-মূর্ত্তি।

মাইল দশ পরে গ্যাঞ্জেস্ কেনাল ব্রিজের ওপাড় থেকে আলিগড় জেলার সীমানা সুরু হ'ল। গয়া জেলার মত এখানে খাপ্‌ছাড়া ভাবে পথের পাশে এক জায়গায় পলাশের বন দেখতে পেলাম। বেলা দশটার সময় আমরা সিকান্দ্রারাউ সহরে এসে বিশ্রাম কর্‌বার জন্যে নেমে পড়্‌লাম। রোদের তেজ আজ বেজায়, রাস্তা ধূলায় অন্ধকার। তারি মাঝে গাছের ছায়ায় ছায়ায় দোকান ব'সে গেছে। কূয়ার ধারে ধারে টিনের নল বা বাঁশের চোঙ্গায় একটি লোক জল ঢাল্‌ছে আর তৃষ্ণার্ত্ত পথিকেরা দু'হাতে ক'রে পরম তৃপ্তির সঙ্গে সেই জল পান করছে। এইরূপ জলসত্রকে এ দেশী ভাষায় পিয়াউ বলে। তৃষ্ণার্ত্ত পথিককে জলদান অতিশয় পুণ্যের কাজ ব'লে এখানকার ধনী ব্যক্তিরা পিয়াউর জন্য মাহিনা ক'রে লোক নিযুক্ত করেন। তারা বেলা ৮টা থেকে ৫টা অবধি পথিকদের শীতল জল দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করে। যুক্ত প্রদেশে ও পাঞ্জাবে এই পিয়াউর যথেষ্ট প্রচলন আছে।
বেলা আড়াইটা তিনটার সময় সিকান্দ্রারাউ থেকে বেরিয়ে পড়্‌লাম। সহর থেকে দলে দলে এক্কা বাইরে যাওয়া-আসা কর্‌ছে। পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে চলেছি। পাশের খোড়ো ও খোলার বসতি, কৃষাণ ও মজুরাণীদের হাস্য-কোলাহলে মুখরিত হ'য়ে উঠেছে।

এসব ছাড়িয়ে আমরা নির্জ্জন পথে এসে পড়্‌লাম,গাছের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূর ব'সে আছে। ছোট ছোট ছানাগুলি রাস্তার ধারে ধারে চ'রে বেড়াচ্ছে। তারা আমাদের দেখে ত্বরিত পদে একটু স'রে গিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়ে রইল, এক-একটা বা আধটুভাবে ডানা নাড়তে নাড়তে গাছের ওপর তার মায়ের কাছে উড়ে গিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হ'ল। তাদের ডানা থেকে খ'সে-পড়া পালক কুড়ুতে কুড়ুতে আমরা এগিয়ে চল্‌লাম।
ক্রমশঃ এসব মিলিয়ে গেল, আবার সারি সারি এক্কা ও মাল-বোঝাই গরু-মহিষের গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে আমরা চলেছি, সকলের গন্তব্যই একদিকে। রাস্তাও খারাপ হ'য়ে এল। প্রত্যেক বড় সহরের প্রবেশ-পথ এইরকম হয়। বুঝ্‌লাম, আলিগড়ের কাছাকাছি এসে পড়েছি।

সহরে বাঁদর ও হনুমানের উপদ্রব খুব। এখানকার উল্লেখযোগ্য জিনিসের মধ্যে মুস্‌লিম ইউনিভার্সিটি। মাখমের কার্‌খানা ও খেলাধূলার জন্যেও আলিগড়ের নাম আছে। জায়গাটি মুসলমান-প্রধান ও আয়তনে বড় কম নয়। ধূলা, নোংরা ও ঘন ঘন বসতিতে পরিপূর্ণ। পথের ওপর একটা বড় বাড়ীর ফটকে বাংলা হরফে 'যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,উকিল' লেখা দেখে আমরা আর ইতস্ততঃ না ক'রে সেইখানেই আজকের মত আস্তানা গাড়্‌বার জন্যে প্রবেশ কর্‌লাম।

গৃহস্বামী আমাদের পরিচয় ও অ্যাড্‌ভেঞ্চার্ শুনে বিশেষ পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। এঁরা এখানে প্রায় চল্লিশ বৎসর বাস কর্‌ছেন। কম্পাউণ্ডে অনেক ঘোড়া রয়েছে দেখে কৌতূহল হ'ল, জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লাম এঁদের ঘোড়ার ব্যবসা আছে। ভাল ঘোড়ার প্রজনন আলিগড়ে হয়। এখানকার অশ্বব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সেইসব ঘোড়া গবর্ণমেন্ট অশ্বারোহী ও অন্যান্য সামরিক বিভাগের জন্য ক্রয় করেন।
ঘরের বারান্দায় 'চারপাই'য়ের ওপর বিছানা করা হ'ল। আজ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা মনে হ'তে লাগল, পায়ের তলায় কম্বলগুলি বিছিয়ে রেখে আমরা নিদ্রাদেবীর আরাধনা কর্‌তে সুরু ক'রে দিলাম। আজ ৪৫ মাইল মাত্র বাইক করা হয়েছে, কলকাতা থেকে মোট ৮২৯ মাইল।

৯ই অক্টোবর শুক্রবার - আজ আমাদের দিল্লী পৌঁছবার কথা। দিল্লী! অতীত গৌরবমণ্ডিত দিল্লী! যেখানে কত সম্রাট্ কত বাদশা'র ভাগ্য নিরূপিত হয়েছে, কত জাতির উত্থান-পতনের অভিনয় যে রঙ্গমঞ্চে হ'য়ে গেছে - যার ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা সমস্ত ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, আজ আমরা সেই দিল্লী-যাত্রী।

প্রথমেই হ'ল রাস্তার গোলমাল। একটু বড় সহর হ'লেই গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড সহরের মধ্যে এসে এমন লুকোচুরি খেলে যে তার নাগাল পেতে হায়রান হ'তে হয়। বরাবর বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে চ'লে আবার ট্রাঙ্ক রোডকে ধরা গেল। পাশে পাশে ছায়াশীতল বাগান কখন বা পথের পাশে শুষ্ক তৃণহীন ধূসর রংয়ের পোড়ো মাঠ। ত্রিশ মাইল পরে রোদ বেশ চন্‌চনে হ'য়ে উঠ্‌ল; আমরাও ট্রাঙ্ক রোড ছেড়ে খুরজা সহরে প্রাতঃরাশ সেরে নেবার জন্যে প্রবেশ করলাম। খুরজার খ্যাতি ঘিয়ের জন্যে, প্রমাণও তার চোখে পড়্‌ল। সহরের মধ্যে ঘিয়ের আড়ত প্রচুর, আশপাশ থেকে গাড়ী বোঝাই টিন টিন ঘি সহরের মধ্যে আসছে। ঘিয়ের গাড়ী চলাচলের জন্যে রাস্তার অবস্তা একেবারে শোচনীয়।
বাজারে প্রাতঃরাশের জন্য মুড়ি ও লাড্ডু ছাড়া আর কিছু মিল্‌ল না। এ অঞ্চলে দোকানে মিষ্টান্ন ছাড়া আর কোন রকম খাবার পাওয়া যায় না, তার মধ্যে লাড্ডুই বেশী। আমরা ভাবলাম দিল্লীর লাড্ডু না কি? এখানে মুড়ি ১৲ সের হিসাবে বিক্রী হয়।

খুরজা সহর থেকে একটি কাঁচা রাস্তা সেকেন্দ্রাবাদ অবধি গিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে মিশে গেছে। ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে যাওয়ার চেয়ে এই রাস্তায় প্রায় দশ মাইল শর্টকাট হয়, সেইজন্যে আমরা খুরজা থেকে আবার ট্রাঙ্ক রোডে ফিরে না এসে এই রাস্তা দিয়ে সেকেন্দ্রাবাদ অবধি যাব স্থির ক'রে বেড়িয়ে পড়্‌লাম। কিন্তু রাস্তাটি সহর থেকে মাইল দুই গিয়ে নিজেকে মাঠের মধ্যে এমন হারিয়ে ফেলেছে যে এরাস্তায় আমাদের শর্টকাটের কিছুমাত্র সুবিধা হবে ব'লে বোধ হ'ল না। কাজে-কাজেই আবার খুরজায় ফিরে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধর্‌তে হ'ল। ঘন্টাখানেক যাবার পর একটা Canal Bridge পার হ'য়ে, সাম্‌নেই বুলানসহর যাবার রাস্তা দেখ্‌তে পেলাম,দূর মোটে

দেড় মাইল। সেখান থেকে ট্রাঙ্ক রোড বাঁদিকে ফিরে চ'লে গেছে। এই মোড়ে ছায়া-ঢাকা একটি বড় পিয়াউ দেখে আমরা জল-খাবার জন্যে নেমে পড়্‌লাম।

ঠিক দেড় মাইল আসার পর আবার একটি মোড়। কাষ্ঠফলকে বাঁ দিকের রাস্তা মিরাট ও সোজা রাস্তা দিল্লীর নিশানা দিচ্ছে। আমরা নির্দ্দেশ - অনুযায়ী সোজা রাস্তা ধ'রে চল্‌লাম। হঠাৎ নজর পড়্‌ল মাইল-ষ্টোনের দিকে। মাইল-ষ্টোনে দিল্লীর কোন উল্লেখ নেই কেবল মিরাটের দূরত্ব-জ্ঞাপক সংখ্যা দেখে আমাদের সন্দেহ হ'ল। পুনরায় মোড়ে ফিরে এসে অনুসন্ধান ক'রে বুঝ্‌লাম কাষ্ঠফলকের ভুল নিশানাই এই বিপত্তির কারণ। পাছে আমাদের মত আর কেউ এই বিভ্রাটে পড়ে সেইজন্যে আমরা নিশান ফলকটিকে ঠিক করে দিয়ে বাঁ-দিকে রাস্তায় প'ড়ে জোরে সাইকেল চালিয়ে দিলাম। এই মোড় থেকে দিল্লী ও মিরাটের দূরত্ব এক - মোট ৪৪ মাইল। ট্রাঙ্ক রোড এইখানে যেমন মাঝে মাঝে হঠাৎ মোড় ফিরেছে সে রকম এপর্য্যন্ত আর কোথাও দেখিনি। একটু অসাবধান হ'লেই রাস্তা গোলমাল। এরকম জায়গায় শুধু নিশানফলকের উপর নির্ভর না ক'রে স্থানীয় লোকজনের কাছে সঠিক সংবাদ নিয়ে অগ্রসর হওয়াই উচিত।

বড় বড় গাছের তলা দিয়ে রাস্তাটা চ'লে গেছে। এখানে অনেক খেজুর-গাছের সারি দেখা গেল। ক্রমে আমরা সেকেন্দ্রাবাদ সহরে এসে পড়্‌লাম। পুরাতন সহর। রোদে কাঠ ফাট্‌ছে, চারিদিকে একটা রুক্ষভাব, বেলা আন্দাজ দেড়টা। আমরা খাওয়া-দাওয়া সার্‌বার জন্যে পথের পাশে একটা সরাইয়ে প্রবেশ কর্‌লাম।

প্রায় ২।০ টার সময় আমরা কিছু দূরে রাস্তার ধারে রোদের জন্যে একটা বাগানের মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'লাম। ঘন্টা দুই বিশ্রামের পর আবার সাইকেলে উঠ্‌লাম। সন্ধার আগে একটা জায়গায় আকের ক্ষেতের ধারে ধারে অনেক ময়ূর দেখা গেল; তাদের ঝরে-পড়া পালকে রাস্তা ছেয়ে গেছে। আমরা এখান থেকে অনেক পালক সংগ্রহ কর্‌লাম। বিজয়ী সৈনিকের মত টুপিতে পালক গুঁজে দিল্লী প্রবেশের জন্য আমরা অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লাম।

ঠিক সন্ধ্যার সময় সাইকেলে আমাদের গাজিয়াবাদে নামিয়ে দিলে। এলাহাবাদ থেকে গাজিয়াবাদ পর্য্যন্ত ই-আই-আর এর ছোট লাইন গাজিয়াবাদ থেকে আবার ডবল লাইন সুরু হ'য়েছে। মিরাটের শাখা-লাইনও এইখান থেকে বেরিয়েছে। একটা রাস্তাও লাইনের সঙ্গে-সঙ্গে ২৮ মাইল চ'লে মিরাটে উপস্থিত হয়েছে।

দিল্লী একটা খুব ছোট বিভাগ। সহরের চারপাশে কয়েক মাইল ক'রে ধ'রে এই বিভাগকে যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব থেকে আলাদা করা হ'য়েছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা যুক্তপ্রদেশের সীমানা ছাড়িয়ে গাজিয়াবাদ থেকে ৪ মাইল পর দিল্লীর সীমানার মধ্যে এসে পড়্‌লাম। রাস্তা বেজায় খারাপ, বেশী গরুর গাড়ী চলাচলের জন্য বড় বড় সহরের প্রবেশ-পথগুলি যেমন হয়। সহরতলীর আলোর প্রতীক্ষা কর্‌তে কর্‌তে চলেছি, কিন্তু কোথায় আলো? অন্ধকারে অন্ধকারে আমরা যমুনা পুলের সাম্‌নে এসে পড়্‌লাম। পুলে কোনোরকম আলোর বন্দোবস্ত নেই, অথচ ওপারেই রাজধানী দিল্লী! বাস্তবের কাছে কল্পনা বেজায় খাট হ'য়ে গেল। সাইকেলের আলোগুলো উজ্জ্বল ক'রে দিয়ে সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা এপারে এসে পড়্‌লাম।

প্রথমেই চোখে পড়্‌ল রাস্তার মিটমিটে কেরাসিনের আলো। সামান্য কিছুদূর যাবার পর একটা রেলের ব্রিজের তলা দিয়ে ওদিকে যেতেই বৈদ্যুতিক আলোক উদ্ভাসিত রাজধানীর রাস্তা এসে পড়্‌লাম। আমাদের আজ দিল্লী পৌঁছবার কথা, এখানকার হিন্দু কলেজের প্রোফেসর শ্রীযুত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জানা ছিল। আমরা ঘোরাঘুরি না ক'রে কাশ্মীর-গেটে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হ'লাম। তিনি আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা কর্‌লেন। আজ আমাদের ঘোরাঘুরি ৯৩ মাইল হ'য়েছে। মিটারে সবশুদ্ধ উঠেছে ৯২২ মাইল।

- ক্রমশঃ -

(প্রবাসী ১৩৩৩ সাল, ক্রমান্বয়ে আশ্বিন, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা)

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ হিতেশরঞ্জন সান্যাল মেমোরিয়াল আর্কাইভ

[মূলের বানান ও বিন্যাস অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। - সম্পাদক]

☆☆☆☆☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Sign Up to see what your friends like.

tell a Friend

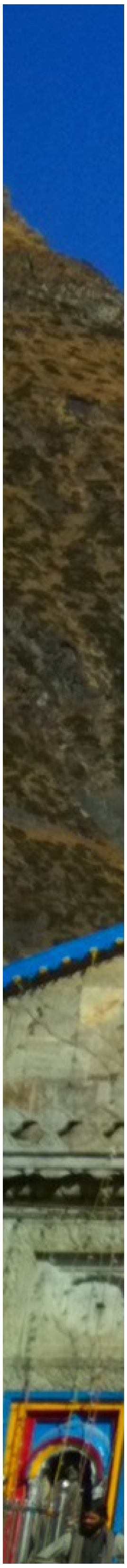

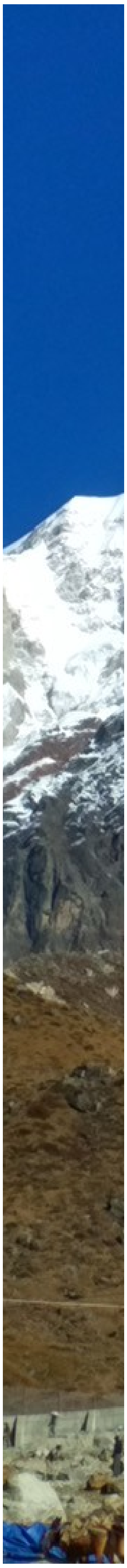

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনি - প্রথম পর্ব

কেদার ভ্রমণের বুকলেট

অভিষেক ব্যানার্জি

~ *কেদারের আরও ছবি* ~

#যা_দেখি_তাই_লিখি
#পর্ব_১
#রাজধানী_এক্সপ্রেস
#যাত্রা_শুরু

দু'বছর পর আবার রাজধানী চাপলাম। কায়দাকানুন পাল্টেছে অনেক। ছ'জন মিলে ল্যাদ খাচ্ছিলাম,সাথে নিজেদের খিস্তিও। ছ'টা বার্থ আমাদের। পাশের সাইড লোয়ারে এক ভদ্রলোক। অবাঙালি। পুরোদস্তুর খানদানি মুসলমান যাকে বলে। ইন্দ্র নাম দিল তার শাজাহান। তিনি দিব্যি খাওয়ার সময় খেলেন, বাকি সময় ঘুমোলেন আর সকালে উঠে উর্দু রাকাত শুনলেন মোবাইলে। সাইড আপারের ছেলেটি কমবয়সী। তালগাছ লম্বা। কিন্তু ওর ডবল ওজনের দুটো ট্রলি। রাখার জায়গা পায়নি। সিটের তলা ভর্তি। চ্যানেলে রাখার জন্য জাম্বো সাইজের গম্ভীর টিটির কাছে উত্তাল খিস্তি খেয়ে শেষে নিজের বার্থে তুলে দ-এ কমা হয়ে শুল। আমরাও ক'হাত টোয়েন্টি নাইন খেলে বোর হয়ে গেলাম। জয়দীপ আমাকে ব্রিজ শেখানোর ব্যর্থ চেষ্টায় বিফল হয়ে বউকে ফোন করায় মন দিল। রাতে ননভেজ খানা অর্ডার দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যের স্ন্যাক্স-এ একটা কাপকেক, একটা ছোট পপকর্ণের প্যাকেট আর একটা তেলতেলে সিঙ্গাড়া জুটেছিল। সঙ্গে চা। মাঝখানে বিখ্যাত কাঠি আর স্যুপ উধাও। আটটায় ডিনার দিল। খিদে নেই। সাড়ে আটটা নাগাদ এবার না খেলে রুটি চামড়া হয়ে যাবে ভেবে শুরু করলাম। মন্দ না হলেও রাজধানীসুলভ নয়। খানতিনেক রুটি, ডাল, আলু-গাজর-বিন-মটরশুঁটি ভাজা, প্লেন ভাত আর চিকেন কষা। আর প্যাকেটের আচার। ওহ, টক দইও ছিল। পরে ন'টা নাগাদ এককাপ করে ভ্যানিলা আইসক্রিমও জুটল। সকালে ব্রেড ওমলেট আর চা খেয়ে পঞ্চান্ন মিনিট লেট করে আপাতত দিল্লি। ওয়েটিং রুম। আবার ট্রেন সাড়ে তিনটেয়, দেরাদুনের জনশতাব্দী। গন্তব্য হরিদ্বার।

#যা_দেখি_তাই_লিখি
#পর্ব_২
#ওয়েটিংরুম
#হঠাৎ_দেখা_আগন্তুক

ওই যে কথায় আছে না কার সঙ্গে কখন কীভাবে দেখা হয় কেউ জানে না। তো ওয়েটিং রুমে ওয়েট করতে করতে আগের পর্ব শেষ করেছিলাম। তারপর হল জল পর্ব। সৌনিপ আর আমি দুজনে গিয়ে ওয়াটার ATM থেকে পাঁচ টাকা লিটার জল ভরে আনলাম। তারপর সে, জয়দীপ, ইন্দ্র আর দেবজিৎ গেল যন্তরমন্তর দেখতে। আমি আর সুদীপ রইলাম ব্যাগ পাহারায়। বেজায় ভিড় এসি ওয়েটিং রুমে। বাচ্চা কাঁদে,সদ্যকিশোরী হাফপ্যান্ট পরে ন্যাকামি করে মায়ের সঙ্গে,দুজন এসে মেঝেয় চাদর পেতে আরেকটা গায়ে চাপিয়ে মাথামুড়ি দিয়ে ঘুমোতে শুরু করে। টয়লেটের পাশে বসে একজন দিব্যি ল্যাপটপে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বানায়,এক বৌদি আরেক দাদার সঙ্গে আমার বর খাবার আনতে গেছে এক্ষুনি আসবে এই সিটে বসবেন না বলে ঝামেলা লাগায়,আর তার বর তাড়াতাড়ি করে খাবার আনতে গিয়ে পাশের লোকের ট্রলিতে হোঁচট খেয়ে ডাল ফেলে দেয় মেঝেয়। এইসব দেখতে দেখতে সময় কাটে। ওরা এসে যায়। পালা করে খেতে যাই। জঘন্য ১ নং প্ল্যাটফর্মের খাবার জায়গাটা। কোনমতে তিনটে রুটি ডাল, আলুর তরকারি আর শাহী পনীরের নামে ঝোলে তাকিয়ে থাকা কাঁচা পনীর খেয়ে ফিরে আসি।
হঠাৎ টুং করে মেসেঞ্জারে মেসেজ রুমাদির। ওরা ঋদ্ধর সাথে বাগিনী ট্রেক করে ফিরছে। ঋদ্ধরা আগেই ফিরছে দুনে। রুমাদিরা দিল্লি হয়ে। দেখা হল। নাকতলা-গড়িয়ার প্রতিবেশীর দেখা হাজার কিমি দূরে। অবাক করল কুঁচো বন্দুকবাজ স্মার্ট ছানাটি। তার সোজাসুজি প্রশ্ন - তোমার নাম কী? আমরা বাগিনী গেছিলাম। আমরা কেদার যাচ্ছি শুনে সে বলল গত বছরই ঘুরে এসেছে। তাই তাকে কোলে নিয়ে চারপাক ঘুরিয়ে দিলুম। কী ভালো লাগে এই কুঁচোগুলোকে দেখলে। একটা ঈদের

চাঁদ যেন আস্তে আস্তে এগোচ্ছে পূর্ণিমার দিকে। হ্যাটস অফ অগ্নিম, হ্যাটস অফ কমা তোকে, তুই বড় হয়ে দাঁড়ি হ', আশীর্বাদ করি। তারপর আর কী। লাগেজ টেনে ১ থেকে ১১ নম্বরের দিকে যাত্রা। জনশতাব্দী ধরা আর মাত্র আধাঘন্টা লেটে হরিদ্বার। হোটেলে একটু ল্যাদ আর বেরিয়ে রুটি তরকারি গিলে আজকের মত ইতি। কাল ভোরে রওনা গৌরীকুণ্ডের উদ্দেশ্যে।
জয় কেদার!!

"এখানে ওখানে পড়ে থাকে মুহূর্তেরা
নুন ছিটিয়ে চেখে নেয়া ধুধু,
আমার তোমার পা আঁকা রাস্তায়
দায় আছে ছায়া ধরার শুধু।"

#যা_দেখি_তাই_লিখি
#পর্ব_৩
#মিসিং_ডায়রি
#বড়া_লেট_হো_গিয়া_সাহাব

"ম্যায় দুনিয়া ভুলা দুঙ্গা তেরি চাহত মে..."
ভান্ডারীজির মিউজিক সিস্টেমে গাঁতিয়ে বাজছে শানুদা। সুদীপ পেনড্রাইভ বাড়িয়ে দিতেই মুচকি হেসে উনি বললেন "ইয়েওলা আচ্ছা হ্যায়"। নর্থইন্ডিয়ায় এসে নিরিমিষ খেয়ে মুখ পচে যাওয়ায় শ্রীনগর ঢোকার মুখে আমরা ধোসা খেলাম ব্রেকফাস্টে। আজ পালা নেমে যাওয়ার হরিদ্বারে। আপাতত গন্তব্য দেবপ্রয়াগ হয়ে হৃষিকেশ। একটু সময় কাটিয়ে ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন। অনেক কথা বলার। পরে বলছি এক এক করে।

#যা_দেখি_তাই_লিখি
#পর্ব_৪
#রইল_ঝোলা_চলল_ভোলা

বহুদিন পর পাহাড়ে বেরিয়েছি। দিলে গরম ডালমুট ভাজা খাওয়ার আনন্দ। সকালে কুত্তাশোঁকা ভোরে কালি চা খেয়ে যাত্রা শুরু করেছি। বোলেরো বলের মত (ঠিকই লিখলাম) এগিয়ে চলেছে ভান্ডারীজির হাত ধরে। দেখতে দেখতে হৃষিকেশ পার। রাস্তায় চারধাম প্রজেক্টের কাজ চলছে। ফোরলেন হাইওয়ে হবে। গাড়ি সব উড়বে সঙ্গে আমরাও।

ব্যাসীর একটু আগে একটা ব্রেক। একটা মনমাতানো ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, সঙ্গে গরম মধুর মত সূর্য। আরেকটু এগিয়ে ভান্ডারীজি গাড়ি থামালেন যে রেস্টুরেন্টে খাওয়ার জন্য, দেখেই আমি আর ইন্দ্র লাফিয়ে উঠলাম। গতবার পাঙ্গারচুলা করার সময় এটাতেই খেয়েছিলাম। পুরানি ইয়াদেঁ তাজা হো গয়ি। সঙ্গে হো গয়ি বেশ কিছু সেলফি। একটা সাউথের বয়স্কদের টিম খাচ্ছিল। তার লিডার ভদ্রলোকের ভুঁড়ির কাছে আমার ভুঁড়ি ব্রণের চেয়ে বেশি কিছু না। আমার পাশের টেবিলে বসে চার পিস ভেজ ক্লাব স্যান্ডউইচ, চারটে পুরী, একটা আলুর পরোটা, দুটো ডিমের ওমলেট আর এক কাপ কফি খেয়ে উঠলেন।

আরেকটু এগোতে এল দেবপ্রয়াগ। আমাদের মধ্যে দেবজিৎ এই প্রথম আসছে উত্তরাখণ্ড। ওকে দেখে হিংসে হচ্ছিল। ও প্রথম দেবভূমির হাওয়া মাখছে। প্রথম দেখছে অনেক নীচের শ্যাওলাপড়া কাঠের জ্বালদেওয়া ধোঁয়া কুন্ডলি পাকিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে সবুজের গায়ে। প্রথম নিচ্ছে দেবভূমির গন্ধ। অবাক চোখে জানালার বাইরে তাকিয়ে বারবার বলছে "হেব্বি

ভাই হেব্বি"। আর আমরা পারলেই ওর পিছনে যে যার মত জ্ঞানভর্তি মিসাইল গুঁজে দিচ্ছি আর খিস্তি খাচ্ছি। এই করতে করতে এল রুদ্রপ্রয়াগ। এখানে লাঞ্চ করে আবার গাড়িতে উঠলাম। দুপুর গড়িয়ে আসছে আস্তে আস্তে। বাইপাসের ধুলো মাখতে মাখতে এগিয়ে চললাম শোনপ্রয়াগের দিকে।

গুপ্তকাশীকে বিদায় জানিয়ে যখন শোনপ্রয়াগের দিকে এগোচ্ছি ডানদিকে কেদারশৃঙ্গ উঁকি দিল। ঠান্ডা বাড়ছে। আলো কমছে। যত আলো পড়ে আসে তত মায়া বাড়ে হিমালয়ের। ফুলহাতা সোয়েটার আর উত্তরাখণ্ডি শাড়িপড়া হাজার বলিরেখার কোনো মহিলা কাপড় তুলে নিয়ে যাচ্ছে ঘরে, হেডলাইট জ্বলতে শুরু করেছে গাড়ির। শোনপ্রয়াগের একটু আগে হঠাৎ গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল।

সামনে বিরাট এক জেসিবি ধসে যাওয়া পাথর তুলছে ট্রাকে। পনেরোমিনিট পর রাস্তা ক্লিয়ার হল। আমরা এগোলাম শোনপ্রয়াগের দিকে। গৌরীকুণ্ড যাওয়ার শেষ জিপ পাবো কিনা ভাবতে ভাবতে অন্ধকারকে কোলে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রইলাম চলন্ত গাড়ির জানলা থেকে। ভান্ডারীজির মিউজিক সিস্টেমে তখন বাজছে..."আজ ফির তুমপে প্যার আয়া হে/ বেহদ অর বেশুমার আয়া হে..."

"তোমার নির্লিপ্ত তাকিয়ে থাকাটা দিও
আমি আমার জানলা তোমায় দেব,
বিনিময় প্রথায় দেনা পাওনা চলুক
যতদিন না দেখার ভারসাম্য হয়।"

#যা_দেখি_তাই_লিখি
#পর্ব_৫
#এবার_কান্ড_কেদারনাথে-১

#ভুঁড়ি_হাঁটু_চচ্চড়ি-১

তো অন্ধকারের মুখে মুখে আমরা পৌঁছলাম শোনপ্রয়াগ। ২০১১তে দেখা শোনপ্রয়াগের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। মাঝে ফাটাতে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কেদারনাথ এর ফ্রি পারমিশন করিয়ে নেয়া হয়েছে। QRকোড দেওয়া যাত্রী ইনফো এখন সরকার থেকে রাখা হয়, সঙ্গে গাড়ির নাম্বারও। যাতে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে প্রশাসন বুঝতে পারে। একটা আইডি কার্ড লাগে শুধু। যদিও এই কার্ড গোটা যাত্রাপথে কোথাও দেখতে চাওয়া হয় না।
ভান্ডারীজি একে একে আমাদের ধূলিধূসরিত স্যাক নামিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। এরপর জনপ্রতি কুড়ি টাকা সরকারি ভাড়াওলা ট্যাক্সি ধরে গৌরীকুণ্ড যেতে হবে। এদিকে কারেন্ট অফ। অন্ধকার কানের কাছে ফিসফিস করে বলছে তোরা যেতে পারবি না। এখানেই থাকা করিয়ে তোদের কাল লেট করাব, একদিন খাবো। আমরা তার কুৎসিত ভয় দেখানোকে ইগনোর করে এগিয়ে গেলাম একমাত্র দাঁড়িয়ে থাকা বোলেরো ট্যাক্সির দিকে। আমরা ছ'জন ছাড়াও আরো পাঁচজন লোক। জায়গা নেই। তবু ড্রাইভার বলেই যাচ্ছে হো জায়েগা। একে একে সবাই বসে পড়ল। পিছনে চার জন,মাঝে আমাদের চার জন তবু বাকি তিন। সামনে তিন প্লাস ড্রাইভার। দুই হুমদো বসে গেল সামনে। আমাকে বলে ড্রাইভারের পাশে বসতে। আমি বসলাম ড্রাইভারের সিটেই। ড্রাইভার অটোর মত বোলেরো চালাবে ভেবেছিল কিনা জানিনা, বসে দেখে তার দোকান আঁটছে না আর দরজাও লাগছে না। অগত্যা জোর করে এক লোকালকে নামিয়ে দিল। আমি বসলাম গিয়ার হ্যান্ডেলের দুদিকে পা করে। ৫ কিমি দূরত্ব নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেলাম। তারপর একটা জবরদস্ত উঁচু সিঁড়ি টপকে প্রায় একখানা অ্যাক্লিমাটাইজেশন হাঁটা দিয়ে জি এম ভি এন (গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম)-এর গেস্টহাউসের সুন্দর কামরায় সেঁধিয়ে গেলাম। কাল থেকে হাঁটা শুরু।

ঠান্ডা মাঝারি থেকে কড়ার দিকে। ১০ কি ১১°C হবে। জমজমাট গৌরীকুণ্ড এখন আগের দিনের ছায়া শুধু। ছেড়ে আসা সাপের খোলসের মত পড়ে আছে। ভিড় নেই। কারো তাড়াও নেই। রাতে রুটি ডাল আর গ্যাস হবার ভয়ে ফুলকপি না নিয়ে লাউয়ের অখাদ্য ঘ্যাঁট খেয়ে স্যাক গুছাতে বসলাম। ছোট ব্যাগে অদরকারি জিনিস রেখে ক্লোকরুমে দেওয়ার ব্যবস্থা করে শুতে গেলাম। উত্তেজনায় ঘুম আসছে না। হাহা হিহিও চলছে। সঙ্গে পিছনে লাগাও। জানলার কাচ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে কনডেন্সড ভেপার। আমাদের মনও ভেপোরাইজড হচ্ছে ধীরে ধীরে। কাল আবার হাঁটব স্বপ্নের পথে বছর সাতেক পর। চোখ গড়িয়ে নেমে আসছে ঘুমের খিদে,শুয়ে পড়লাম এগরোলের মত কম্বল জড়িয়ে।

সকাল হল সকালের মতোই অ্যালার্মের শব্দে। ভোর ছ'টায় বেরোনো ঠিক হয়েছিল। বেরোলাম ৬.২৫-এ। রোদ তখনো মাটি ছোঁয় নি। আমরাও আলাভোলা সকালের ঠান্ডা মাখতে মাখতে এগিয়ে চললাম সিঁড়ি ভেঙে। রাস্তার ধুলো,পড়ে থাকা পাতা, চা দোকানের ত্রিপল,সাইনবোর্ড,খাবার কুড়োতে বেরোনো কুঁচো পাখির দল, খচ্চরের শুকনো গু,স্যাঁতসেঁতে পাথর,শিশিরে চোবানো ঘাস,ঘন্টা বাজিয়ে পাশ কাটানো খচ্চর আর একটানা ধুপধুপ শব্দকরা পায়ের আওয়াজ আমার সঙ্গে চড়াই ভাঙতে লাগল। কান ঘেঁষে এক পশলা রোদ বেরিয়ে গেল একটা বাঁক ঘুরতেই। অনেক হাঁটা বাকি। এখন এই অব্দি থাক নাহয়।

"হোক নাহোক রোদের স্বয়ম্বর
আমাদের পিঠ পাতাই থাক,
নামের সাথে তুলনা হোক সকালের
কিছু না পাওয়া পাওয়া পাক।"

#যা_দেখি_তাই_লিখি
#পর্ব_৬_এর_পর_যা_হয়_তাই
#এবার_কান্ড_কেদারনাথে_২

#ভুঁড়ি_হাঁটু_চচ্চড়ি_২

"যেভাবে জলদি হাত মেখেছে ভাত
নতুন আলুর খোসা আর এই ভালোবাসা..."
গুনগুন করতে করতে এগোচ্ছি। ছ'জন নিজের মত হাঁটছি। ঠান্ডা ভালোই। আলগা শিমুলতুলোর মত রোদ উড়ে বেড়াচ্ছে পাতার ফাঁক দিয়ে। খবর ছিল আগের দিন দুপুরেই কেদারে "ভারী বরফ বারি হুই হে"। তাই রিস্ক নেওয়া যায়নি। আমি চলেছি সবার শেষে। হাঁফাতে হাঁফাতে। সকালের বাতাসে অক্সিজেন একটু কম। তাছাড়া অভ্যেসমত ছবিতোলা আর ল্যাদখাওয়া দুটোই আছে। সঙ্গে মাঝে মধ্যে মুখে চালান হচ্ছে প্রিয় ম্যাংগোবাইট। শুধু চা খেয়ে বেরোনো হয়েছে। সামনে জঙ্গলচটি। গৌরীকুণ্ড থেকে চার কিমি। ওখানে হবে ব্রেকফাস্ট। সুন্দর একটা ওয়াটারফলস পেরোলাম। সাইনবোর্ডে লেখা "কৃপয়া রুক কর প্রকৃতি কা আনন্দ লিজিয়ে"। লোকজনকে বলেও দিতে হয় শুধু হেঁটো না, সঙ্গে দেখোও! ভালো লাগল। একটু এগিয়ে চড়াইশেষে সামান্য সমান রাস্তা পেয়ে মনটা নেচে উঠল। একটানা চড়াই উঠতে কার ভালো লাগে? তার ওপর এই পাথরের রাস্তায়। দিওয়ালির আলোর মত গাছ ছুঁয়ে রেখেছে এপারের পাথরের গা। বেশ একটা ক্যালিডোস্কোপমার্কা প্যাটার্ন হয়ে আছে রাস্তার ধুলোয় রোদ-ছায়ার। নিঃশ্বাসের জলীয়বাষ্প লম্বা রোদের ফালি পেয়ে একপশলা ধোঁয়া হয়ে জাতে উঠে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। পাশ দিয়ে একটা খচ্চরচাপা টিম গেল "জয় কেদার" বলতে বলতে। সামনেরটায় বাবার সামনে বসে বছরদুয়েকের এক খুদে। তাকে বেড় দিয়ে কাপড় দিয়ে বাঁধা আছে বাবার কোমরের সাথে। সে দুলতে দুলতে ঘুমোচ্ছে। গালগুলো লালচে হয়ে আছে ঠান্ডায়। একমুহূর্ত দাঁড়ালাম। যেতে দিলাম। তারপর জল খেয়ে, যেতে হবে-কে টুপিতে ভরে মাথায় চড়িয়ে এগোতে শুরু করলাম। জঙ্গলচটি আর আধা কিমি।

আমি যখন পৌঁছলাম জয়, সৌনিপ, সুদীপ-রা আগেই বসে ছিল একটা চা দোকানে। গরম গরম টম্যাটো ম্যাগির অর্ডার দেয়া হল। জয় ম্যাগি খায় না। ওর নিজের ইপ্পি ছিল। দোকানদার হাসিমুখে সেটাই বানিয়ে দিল ওকে। আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম গরম ঝোল ঝোল ম্যাগির উপর। ওখানেই আলাপ হল আরো বাঙালি কয়েকজন টিমের সঙ্গে। এই সময় বাঙালি ছাড়া বড় একটা কেউ যায় না কেদারনাথ। যে যার মত সময়ে উঠে পড়ল। ট্যুরের ক্যাশিয়ার আমি। দাম মিটিয়ে স্যাক কাঁধে নিলাম। পরবর্তী গন্তব্য ভীমবালি। এখান থেকে আরো ২ কিমি।

নতুন রাস্তা বেশ ভালোভাবেই বানানো। মোটামুটি ২০০ মিটার অন্তর বসার জায়গা আর শেডদেওয়া রেনশেল্টার। তবে রাস্তার চড়াই বেড়েছে। ডানদিকে মন্দাকিনীর দিকে তাকালেই ভয় লাগে। চারিদিকে ধ্বংসের চিহ্ন এখনো বেশ স্পষ্ট। গৌরীকুণ্ডে খাবার দোকানে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি ওখানকারই বাসিন্দা এবং বন্যার সময় ওখানেই ছিলেন। সেসব বলার সময় চোখ মাটির দিকে চলে গিয়েছিল। হয়ত কোনো চিকচিকে পারদের ব্যর্থ দীপ্তি লুকোতে চেয়েছিলেন। জানি না। ঘোড়াওলাদের তেমন দৌরাত্ম্য নেই। তবে মাঝে মাঝেই পেরিয়ে যাওয়ার সময় আওয়াজ আসছে "দাদা ঘোড়া লেঙ্গে আগে বহুৎ চড়াই হে"। আমরা তেজের সঙ্গে না বলছিলাম। তখনও কি জানতাম চড়াই এর বহর! চড়াই যে চড় মেরে কনফিডেন্সের কুলকুচি করে দেবে কে জানত।

গল্প করতে করতে যাচ্ছি। সেলফি, রাস্তাফি, খাদ-ব্রিজ-নদী-গাছপালা-কেদার শৃঙ্গ-ফি সবই চলছে। কুঁচো কুঁচো পাখি (মনে হল হিমালয়ান সানবার্ড, ভুল হলে কেউ শুধরে দেবেন) বেশ আনন্দে ডাকছে। আমরা যখন ভীমবালি পৌঁছলাম জয় আর সৌনিপ এগিয়ে গেছে। ইন্দ্র দেখি একটা দোকানে বসে রুটি তরকারি খাচ্ছে। আমাদেরও বলল। আমরা শুধু চা খেলাম। এরপর একটা ব্রিজ পেরিয়ে নদীর ওপারে যেতে হবে। তারপরই শুরু পিছনফাটানো চড়াই। ডানদিকে রাস্তা দেখা যাচ্ছে। উত্তুঙ্গ চড়াই। দেখে মনে হচ্ছে অদ্দুর উঠতে হবে? একটু এগোতেই এক মধ্যবয়স্ক বাঙালি দাদার সঙ্গে দেখা। সামনে দুটো ব্রিজ। একটা একটু এগিয়ে আরেকটা সামনে। উনি বললেন যদি দূরের ব্রিজটা ধরা হয় তাহলে রাস্তা একটু খারাপ আর চড়াই বেশি কিন্তু প্রায় ২ কিমি মত রাস্তা কম। আর সামনেরটায় চড়াই কম রাস্তা প্লেন কিন্তু বেশি হাঁটতে হবে। আমরা ঠিক করলাম চড়াই হোক কিন্তু বেশি হাঁটব না। সুতরাং দ্বিতীয় ব্রিজ। পেরিয়েই শুরু হল জিভবেরোনো চড়াই। সিঁড়ি ভাঙাটা বেশি

কষ্টের। পায়ে চাপ পড়ে খুব। আস্তে আস্তে থেমে থেমে উঠতে লাগলাম। এখান থেকে লিনচোলি ৪.৫ কিমি। মনে হতে লাগল দিল্লি অনেক দূর। কেদার তখনও প্রায় ১১ কিমি।

ধুঁকতে ধুঁকতে ২ কিমি এলাম। একটা বাঁক ঘুরতেই সামনে দেবদূতের মত হাজির হল কালিকমলি-র ফ্রী চায়ে কি দুকান। পয়সা না দিয়েও গরম জল, চা, ছোলাভাজা, লেবু লজেন্স, বিস্কুট, বুরহান্স(ওদের উচ্চারণে)এর শরবত (রোডোডেনড্রনের) পাওয়া যায়। আমরা মুখ ধুয়ে ছোলাভাজা আর চা খেয়ে একটু বসে আবার এক গ্লাস করে শরবত খেলাম। ষাট টাকা এমনি দানবক্সে দিয়ে চাঙ্গা হয়ে আবার স্যাক কাঁধে নিলাম। এবার একেবারে লিনচোলি। বেলা বাড়ছে। সাড়ে এগারোটা বাজে। বেশি দেরি করলে ওয়েদার খারাপ হওয়ার ভয়। তাড়াতাড়ি পা চালাল সবাই। আমি পিছনে পিছনে আস্তে আস্তেই যেতে থাকলাম। পা অল্প ব্যথা করছিল। ভিতরে সব ঘামে ভেজা। টুকটুক করে এগোতে এগোতে লোয়ার লিনচোলি দেখা গেল। একটা কর্নার বেঞ্চে বসলাম। সামনে রাস্তার কাজ হচ্ছে। একজন বিশাল হাতুড়ি দিয়ে উমফঃ উমফঃ জাতীয় শব্দ করে পাথর ভাঙছে। আমি সিঁড়ি আর সে পাথর। দুটো ভাঙায় ঘাম একই কিন্তু শ্রম এক নয়,পাথেয় এক নয়,উপায় এক নয়...এক নয় জীবনটাও। যে পথে আমরা যাব ট্রেকার হয়ে সেই পথটাও বানাবে কয়েকটা জীবনের কারিগর। কাগজের দাম সব সময়েই মাটির চেয়ে বেশি।

থেমে গেলে হয় না। গতিময়তাই সব। গা ঝাড়া দিয়ে উঠলাম। পা ব্যথা, শ্বাসের তীব্রতা সবকিছুকে উপেক্ষা করে এগোচ্ছি। লিনচোলি দেখা যাচ্ছে। পৌঁছে গেলাম জি এম ভি এন। স্যাক নামানোয় স্বস্তি। হাতমুখ ধুয়ে টয়লেট করে খেতে বসলাম। ডাল ভাত রুটি তরকারি খেয়ে রোদে একটু গা এলিয়ে দিলাম। বেশ ভালো লাগছিল। আর মাত্র ৪ কিমি বাকি। যদিও শুনেছি এবার চড়াই আগের চেয়েও বেশি। জি এম ভি এন-এর একজনকে জিজ্ঞেস করতে বললেন "আরে হম লোগ তো এক ঘনটে মে চড় যাতে হে, আপলোগ দো ঘন্টা মানকে চলিয়ে।" মনে ফুর্তি খেলে গেল। আহা আর মাত্র দু'ঘন্টা, তাহলেই দেখা মিলবে তাঁর। এতদিন পর। বুকে শিবজির ডুগডুগি নিত্য করতে শুরু করল। তখনও কি জানতাম খেল অভি বাকি হে।

"খানিকক্ষণের গল্প কালকে শুনো
আজ সময় খবর নেবার,
ভালো আছে সে,যে একা হয়েছিল
তোমার সঙ্গে শেষবার"?

#যা_দেখি_তাই_লিখি
#পর্ব_পৌনে_৭
#এবার_কান্ড_কেদারনাথে_৩
#ভুঁড়ি_হাঁটু_চচ্চড়ি_৩
#The_Golden_Moment

প্রথমেই বলে নি। ব্যাপারটা আর লাইভ নেই। Deferred live বা Exclusive বা পরের দিনের বাসি লুচি বলা যেতে পারে। ভুঁড়ি একটুও না কমার দুক্ষু নিয়ে কলকাতা ল্যান্ড করেছি আজ কালকের বাসী রাজধানীতে। সে পরের গপ্প, পরেই হবেখন। এখন যেটা চলছিল চলুক। এটা এখন #যা_দেখেছি_তাই_লিখছি তে কনভার্ট হয়ে গেছে। ফিরভি, show must go on...

তা লিনচোলির চোলি মুক্ত হওয়ার জন্য এগোতে হল। বাতাসে খচ্চরের টাটকা+বাসি+শুকনো বিষ্ঠার মনমাতানো সুবাস। মাঝে মাঝে উল্টোদিকের হুটোপুটি করে দৌড়ে আসা খচ্চরবাহিনী সামলাতে ইন্দ্র রাহ-রাহ-জাহ-জাহ-

হুররররররাআআআহহহ জাতীয় শব্দ করছে। তাতে কখনও কাজ হচ্ছে কখনও খচ্চর খচড়ামি করে আরও গা ঘেঁষে ছুটছে। আমরাও একটু থামার অজুহাত পেয়ে যাচ্ছি। ফাটানো চড়াই, কোন মা বাপ নেই। আমি অনুরোধ করছি যারা হেঁটে যাবেন তাঁরা হাল্কা ওজন নেবেন। একটু হাঁটার পর আমি যথারীতি পিছিয়ে পড়েছি। সামনে শুধু দেবজিৎ আগের বাঁকে ওপরে। হঠাৎ ডান পায়ের কাফ মাসলে খুব জোর ক্র্যাম্প ধরল। খুব ঘাম হচ্ছিল শরীর থেকে বেরোনো জল খেয়ে পোষানো যায়নি। পা ধরে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ওকে বললাম এগিয়ে যেতে। এইজন্য মেডিক্যাল বক্স আমি নিজে ক্যারি করি। আস্তে আস্তে পা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উল্টোদিকে টান দিয়ে আর মেসেজ করে ক্র্যাম্প ঠিক করলাম। একটু দাঁড়িয়ে জল খেয়ে ভলিনি স্প্রে করে আবার উঠতে থাকলাম ভয়ানক চড়াই। এখানে অনেকের মনে হতে পারে কেদারনাথেই এই, এ ট্রেক নিয়ে বিরাট বিরাট বুলি ঝাড়ে? তাঁদের উইথ ডিউ রেসপেক্ট বলছি কার কোন্ ট্রেকে কী হয় কেউ বলতে পারেনা। আমি শেষপর্যন্ত চেষ্টা করি কমপ্লিট করার, এটাই আমার কাছে অনেক।

একটু লেংচে একটু থেমে এগোচ্ছি। বেলা পড়ে আসছে। ওপরে ওঠার কোনও বিরাম নেই। বন্ধুরা বলছে ঘোড়া নিয়ে নে। কিন্তু আমি অনড়। হেঁটেই উঠব। হাল সবারই কম বেশি খারাপ। ইতিমধ্যে হঠাৎ সুদীপের জুতোর সোল খুলে হাঁ। ফেভিকুইক বের করে দেখা গেল ওই ঠাণ্ডায় জমে গেছে। দেবজিতের কাছে নাইলন দড়ি ছিল। ওটা দিয়ে বাঁধা হল কোনমতে। এতে ওরও স্পিড গেল কমে। আমরা তিনজন একসঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। জল খেতে খেতে তিনজনেরই স্টক প্রায় শেষ। সৌনিপ, জয় আর ইন্দ্র এগিয়ে গেছে। মাথা নীচু করে শুধু সামনের পাঁচফুট রাস্তার দিকে তাকিয়ে এগোতে থাকলাম। এটা আমি করি যখন হাঁটাটা একঘেয়ে হয়ে যায়, হ্যাঁ, যতই আমরা স্বীকার না করি, একটা সময় কিন্তু এটা হয়।

ঠান্ডা বাড়ছে। ঝিমিয়ে আসছে বিকেল। শনিবারের বারবেলায় বেরোতে বারণ করা মায়ের মত চৌকাঠ আগলে দাঁড়িয়ে আছে কেদারশৃঙ্গ। ঝিমিয়েপড়া মনের কোণে একটাই ভরসা অপুর মত উঁকি দিচ্ছে জানলায়, পৌঁছতে হবে, ছুঁতে হবে কেদারজিকে। আর ২ কিমি বাকি কেদারনাথ। একটা আনন্দ আবার ফিরে আসছে, ফিতে দিয়ে মাপলে সেই নরম হাতটা দুবার ধরার সমান হবে। সামনে 'ঘোড়া পড়াও', যতদূর মনে হয় ঘোড়ার পথ এখানেই শেষ। কেদার বেসক্যাম্পের শুরু আরেকটু এগিয়েই। হঠাৎ ফোন এল সুদীপের। সৌনিপ! জয়ের একটু মাথা ভার হয়েছে। তাই মেডিক্যাল চেকআপ পয়েন্টে ঢুকে ডাক্তার দেখিয়েছে। উনি বলেছেন একটু বেশি জল খেয়ে রেস্ট নিয়ে এগোতে আর কেদারেই হসপিটালও আছে তাই ভয়ের কোনও কারণ নেই। এর মধ্যেই আমরাও পৌঁছে গেলাম। দেখলাম বিশেষ কিছু ভয়ের নেই। আবার শুরু এগোনোর। সামনে কেদারনাথ দেখা যাচ্ছে।

আলো পড়তে পড়তে যখন শেষমুহূর্তে মাকড়সার ঝুলে একটু দোল খেয়ে সময় কাটিয়ে নেয়, ঠিক সেরকম সময় আমরা পৌঁছে গেলাম জি এম ভি এন-এ। শেষ একটাই রুম ছিল আটজনের ডর্ম। ইন্দ্রের ম্যানেজের ঠেলায় ম্যানেজার আমাদের পুরো রুমটাই দিয়ে দিল। বাঙ্কবেডের রুম। দুটো দুটো করে বাঙ্ক। কটেজের নাম 'স্বর্গারোহিনী'আর রেস্টুরেন্টের নাম 'অন্নপূর্ণা'। কটেজের ছাদের কার্ণিশের ঠিক নীচে মাটিতে একতাল করে বরফ জমে আছে। ক্লান্ত পায়ে নিজেদের রুমে ঢুকলাম রীতিমত ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে। রুমের ভিতরটা গরম। টয়লেট একটাই, তবে পরিষ্কার, সুন্দর। ওরা বলে দিয়েছিল কল বন্ধ না করতে তাহলে জল জমে যাবে,অগত্যা বালতি উপচে পড়লেও জল চালুই থাকল।

আমাদের মধ্যে সৌনিপ সবচেয়ে ফিট। সবাই এখানে ব্যথা,ওখানে যন্ত্রণা, মাথা টিসটিস, গা টিসটিস, হাত নিসপিস, কেস জন্ডিস করলেও সে দিব্যি মজায় আছে। আমরা কী কী চাপাব ভাবছি আর সে কখন বেরিয়ে মন্দিরে যাবে আর কে কে যাবে তাই নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের চেঞ্জকরা শেষ হওয়ার আগেই বাইরে থেকে আওয়াজ দিল, "কাকারা বাইরে আয়, যা দেখতে এসেছিস দেখে যা!" আমরাও ছুটলাম ক্যামেরা হাতে। বাইরে বেরিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম! শেষবিকেলের ছেঁড়া আলোয় কেদাররেঞ্জ মাখামাখি। এই তাহলে সেই বিখ্যাত "গোল্ডেন মোমেন্ট অফ কেদার"! এই অপূর্ব রঙছবির বর্ণনা দেবার ভাষা আমার জানা নেই।

উজবুকের মত ফ্যাকাশে ভ্যাবলা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম ওই সিডাকটিভ, আই-অরগ্যাজমিক দৃশ্যের দিকে। প্রথমে ভুলে গেছিলাম ছবি তুলতে। তারপর আর শাটার থামেনি কিছুক্ষণ। ভাই আর কয়েকজন প্রিয় বন্ধুকে ভিডিও কল করে দেখালাম, কেউ কেউ ফোন রিসিভ না করায় দেখতে পেল না। দেখাদেখি আর মাখামাখি শেষ হবার নাম নেই। এতদিন পর পাহাড়ে গিয়ে আদর শেষ হতেই চায় না! এমনি করেই ঝুপ করে পোড়া নিভন্ত দেশলাইকাঠির মত লাল থেকে কালো হয়ে সন্ধে নামল কেদারক্ষেত্রের বুকে। সঙ্গে সঙ্গে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে এল ঠান্ডা। চা খেতে গিয়ে ডিসপ্লে বোর্ডে দেখলাম তাপমাত্রা -১°C।

ওরা বলছিল আরতি দেখতে যাবে। আমার একটুও শক্তি ছিলনা। পায়েও ব্যথা খুব। তবুও একটু গেলাম। মন্দাকিনী আর কেদার-সরস্বতীর মিলনস্থলে একটা ঘাট বানানো হয়েছে। ওখান থেকে আমি আর সুদীপ ফিরে এলাম। ভীষণ ঠান্ডা লাগছিল। ফিরে দেখি একটা শেডের নীচে জি এম ভি এন-এর লোকেরাই আগুন জ্বালিয়ে বসে গল্প করছে।

আমরাও চেয়ার নিয়ে জুটে গেলাম। বেশ আরাম হল কাঠকয়লায় লালচে আগুনের নেশায় গা সেঁকে। তাপমাত্রা তখন নেমে -৩°C। ওরা ফিরল পৌনে আটটা নাগাদ। তারপর খাওয়া - রুটি তরকারি,ডাল। গরম জল ভরে নিয়ে বোতল চালান করে দিলাম জ্যাকেটের ভিতরে। রুমে ফিরে শোবার পালা। একটা কম্বল আর একটা ভীমশিলার মত ভারী লেপ। দুটোই চাপা দিয়েও প্রথমে ঠাণ্ডা কাটছিল না। বিছানা বরফজলের মত ঠান্ডা। এপাশ ওপাশ করছি। ঘুমের নাম গন্ধ নেই। বুকে কয়েক মণ চাপানো আছে যেন। এদিক ফিরলে ওদিক জমে বরফ। দোকান বাঁচাই নাকি স্থায়ী আমানত বুঝে পাচ্ছিনা। এদিকে পাশের ঘর থেকে ঘোঁড়ৎ-ফুই-ফুই-ফুই শোনা যাচ্ছে সুদীপের। আর উপরের বাঙ্কে সৌনিপ পাশ ফিরলেই ক্লিনিচ-ক্ল্যাং-খেয়াং করে লোহার বাঙ্ক নড়ছে। নীচে জয়ের ভ্রূক্ষেপ নেই। ঘাড় কাত করে মাথায় টুপি পরে বটগাছের ডালের মত ঘুমোচ্ছে। আমার বগলের তলা দিয়ে গলে জলের বোতল খালি মেঝেয় গড়াচ্ছে আর আমি তুলছি। এই করতে করতে বাঙালি লড়াইয়ে হেরে চোখ বুজেছে কখন খেয়াল নেই।

"নক্ষত্র জানে সে যখন নিভে যাবে
তখনও কেউ না কেউ দূর থেকে দেখবে
সে জ্বলছে দাউ-দাউ করে,
আসলে নেভাগুলো কেউ দেখতে চায়না...।"

#যা_দেখি_তাই_লিখি
#পর্ব_আহ্লাদে_৮
#হাঁটু_ভুঁড়ি_চচ্চড়ি_৪
#কেদারনাথ
#ফিরব_বললে_ফেরা_যায়_নাকি

"So if you're feeling lonely, don't
You're the only one I'll ever want
I only want to make it good
So if I love you, a little more than I should
Please forgive me, I know not what I do
Please forgive me, I can't stop loving you..." -ব্রায়ান অ্যাডামস

আজ ট্রেনে আসতে আসতে গানটা শুনছিলাম হেডফোনে। যতবার শুনি হাত পা অসাড় হয়ে যায় এক অদ্ভুত গাঢ় অনুভবে।

এমন করে কেউ ভালোবাসতে পারে? পারে হয়ত। ভালোবাসার কোনও খোদাই করা মহাকাব্য নেই। তবু কিছু ভালোবাসা ছুঁয়ে থাকে সারাজীবন। হয়তো তারাই ঘুম ভাঙিয়ে দেয় ঠিক সময়ে, ঘুমের আধবোজা হাত অ্যালার্ম স্নুজ করে দিলে। এই বাঙালি তখন সেদিন অনেক কষ্টে ঘুমের তলানিতে হাবুডুবু। সকালে উঠে মহাদেবকে ছোঁয়ার কথা আছে। পুজো দিয়ে নেমে যাওয়া আছে গৌরীকুণ্ড অবধি। সে এক হাঁটুভাঙা কসরৎ। তবু উপায় নেই। নামতেই হবে। এরপর মদমহেশ্বর আছে। উঠে পড়লাম সাড়ে চারটেয়। লেপ থেকে বেরোতেই হিংস্র ঠান্ডা গিলে খেতে এল। পরিষ্কার হয়ে মোটামুটি ভালো জামাকাপড় পরে তৈরি হলাম। একে একে ঘোড়ৎ ফু'রা উঠল। সৌনিপ এর মধ্যেই একবার বেরিয়ে আওয়াজ দিয়েছে। বেশ মোটা করে অ্যান্টিঠান্ডা মাল চাপিয়ে বাইরে গেলাম। ঠান্ডা হাওয়ায় গাল কেটে যাচ্ছে। নাকের ডগা অনুভূতিশূণ্য। কিন্তু ওই অপার্থিব আধআলোয় কেদাররেঞ্জকে দেখে ভবা পাগলা হয়ে গেলাম। ভাপ দিয়ে চশমা পরিষ্কার করার আগের কাচের মত আকাশ। পুবদিক আড়মোড়া ভাঙছে। সকালের বাসি চুমুর দিনগলানো ভালোবাসার মত গন্ধ বাতাসে। সাদা কালোর দাবার বোর্ড আস্তে আস্তে রং মাখছে। হাজার বাঁশপাতার খসখসানি মনেকরানো আধপাগল হাওয়া কাঁপাচ্ছে মন আর তনু। আমরা দুজন অবাক বিস্ময়ে আলোর বিজয় উৎসব দেখার অপেক্ষায় আছি।

সৌনিপ ফোন করে জানাল ভিড় কম। আমরা দৌড়লাম। টাকাপয়সা ইত্যাদি সঙ্গে করে নিয়ে আবার চললাম মন্দিরের দিকে। ইন্দ্র আগেরদিন মহাকাল বাবা নামে একজন পুরোহিত ঠিক করে রেখেছিল। অতঃপর পুজোর সামগ্রী কেনা এবং লাইনে দাঁড়িয়ে পুজো দেওয়া। আবার সেই মন অবশকরা অনুভূতি ফিরে পাওয়া মহাদেবকে ছুঁয়ে। এই মন্দির ঘোর নাস্তিকেরও বুক কাঁপিয়ে দেবেই দেবে। একবুক ভালোলাগা নিয়ে মন্দির পরিক্রমা করা হল পাঁচবার। এবার নামার পালা।

মন্দির চত্বর এখন এখন এক খোলা চাতালের মত। ওখান থেকে নেমে আলুর পরোটা/রুটি/লুচি যে যেমন পারল খেয়ে গেস্ট হাউসে ফিরলাম। ধরা আছে পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা লাগবে নামতে কারণ সবারই পায়ে বেশ ব্যথা। সাড়ে দশটায় বেরোনো টার্গেট থাকলেও এগারোটা বেজে গেল। ছোটবেলায় আমরা একটা গজা খেতাম যার নাম ছিল 'দাঁতের লড়াই'বা আমরা বলতাম 'মদন কটকটি'। চিবোতে দাঁত খুলে যেত। এখানে হল হাঁটুর লড়াই। একটা করে অসমান সিঁড়ি নামি আর হাঁটু কটকট করে ওঠে। তার উপর বেল্লিক ভুঁড়ি। নামছি। বাঁক ঘুরছি আর অবাক হয়ে দেখছি প্রতি বাঁকে এক নতুন রূপ। ছবি তুলে পোষাচ্ছে না, যেমন পোষায় না ভালো জাতের মটন বিরিয়ানি খেয়ে।

আধময়লা তারজালির মত পথে পড়ে আছে রোদ ছায়া। যেমন খুশি কুড়িয়ে নাও। ইচ্ছে না হলে পাশ কাটিয়ে যেতে পারো। অনেকে উঠে আসছে। কারো মুখে প্রত্যয় কারো মুখে দুশ্চিন্তা। যারা ঘোড়ায় উঠছে তারাও ভয়ে,এই বুঝি পড়ে গেল। চড়াই উৎরাই দুটোই বেশ খাড়া। লিনচোলি এসে গেলাম ঘন্টা দুয়েই। আরেকটু নেমে চা খেতে বসা হল। ওখানেই ডিসাইড করা হল মদমহেশ্বর না করে তুঙ্গনাথ করা হবে। এদিকে শোনা গেল তুঙ্গনাথ মন্দির হয়তো বন্ধ। তাতে কী, ট্রেকটা করা হবে এটাই ঠিক হল। একটানা অনেকটা নেমে আবার পরের স্টপ সেই কালিকমলি চায়েতে। বুরহান্স পান করে চাঙ্গা হলাম। একজন চাইনিজ মহিলা একাই উঠছিলেন। ইন্দ্র তাঁকে ফ্রি ড্রিঙ্ক-এর কথা বলল। উনি দুমিনিট দাঁড়িয়ে কিছু না খেয়েই হাঁটা দিলেন। চারজন করে লেবার দুদিকে কাঁধে নিয়ে লম্বা স্টিলের ব্রিজের রডজাতীয় পার্টস বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। দেখে কষ্টও হচ্ছিল শ্রদ্ধাও। চিরকাল কিছু মানুষ সভ্যতা বয়ে নিয়ে চলেছে। তাই আমরা আছি।

আজ আমরা দ্বিতীয় রুট ধরেছি। লম্বা রাস্তাটা। বুঝলাম ভুল হয়নি। রাস্তা অনেক ভালো আর পথের সৌন্দর্য অনেক অনেক বেশি। গাছে ফল কালার্স ধরছে। আকাশের নীল দিয়ে গেঞ্জি ধোয়া যাবে। পাশ ফেরানো সিঁদুরকৌটোর মত লাল ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে। জলছবি সাঁটানো অঙ্কখাতার মত ল্যান্ডস্কেপে হেঁটে চলেছি আমরা ক'জন। ভীমবালি এসে গেল। লাঞ্চ হবে। সময় কম, তাই আবার ঝোল ম্যাগি। জয় শুধু চা বিস্কিট খেল। এখন আর ৬ কিমি বাকি। সবাই বেরিয়ে পড়লাম জলদি খেয়ে। প্রায় তিনটে বাজে। বেলা পড়ে আসছে। গাছের পাতায় আলস্য ফিসফিস করতে শুরু করে দিয়েছে। আহ্নিকের জন্য তালদিঘিতে ঘটি ডুবিয়ে স্নান হয়ে গেছে তার। এবার গা মুছে উপরে উঠে আসা শুধু। জয় আগেই বেরিয়ে গেছে। সুদীপ আর দেবজিৎও লম্বা পায়ে ছুট দিয়েছে। ইন্দ্রেরও হাঁটু ভোগাচ্ছে। আমি, সৌনিপ আর ও তিনজনে আস্তে আস্তে এগোতে থাকলাম। জঙ্গল চটি পৌঁছে একটা টি আর ভলিনি ব্রেক নেয়া হল। ওদের তখন আর মাত্র ২.৫ কিমি বাকি আমাদের ৪। সন্ধে আর অপেক্ষা করতে পারছে না। তার মৈথুনে দেরি সইছে না। প্রেমিকা তমসা অপেক্ষায় তার। আমরাও যতটা পারছি জোরে হাঁটছি। দূরে যখন গৌরীকুণ্ড দেখা দিল পাহাড়ি আকাশের হ্যান্ডমেড পেপারে তখন কালো রং জল ছুঁয়ে বিস্তার নিচ্ছে দ্রুত। ঝুপ করে নিবে যাওয়া দিনান্তে ঠিক সুর কেটে যাওয়ার আগে শেষ সিঁড়ি টপকালাম গৌরীকুণ্ড জি এম ভি এন-এর। নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঘামের টুকরো মিশে তখন ঘুরপাক খাচ্ছে মন্দাকিনীর স্রোতে।

"দাম দিয়ে কেনায় বরাদ্দ যতটা
অগোছালো আমার ইতিহাসও ততটা,
ডানদিকে থাকা হয়ত সহজ নয়
তাইতো ভয় যদি হাত বাড়াতে দেরি হয়।"

(ক্রমশ)

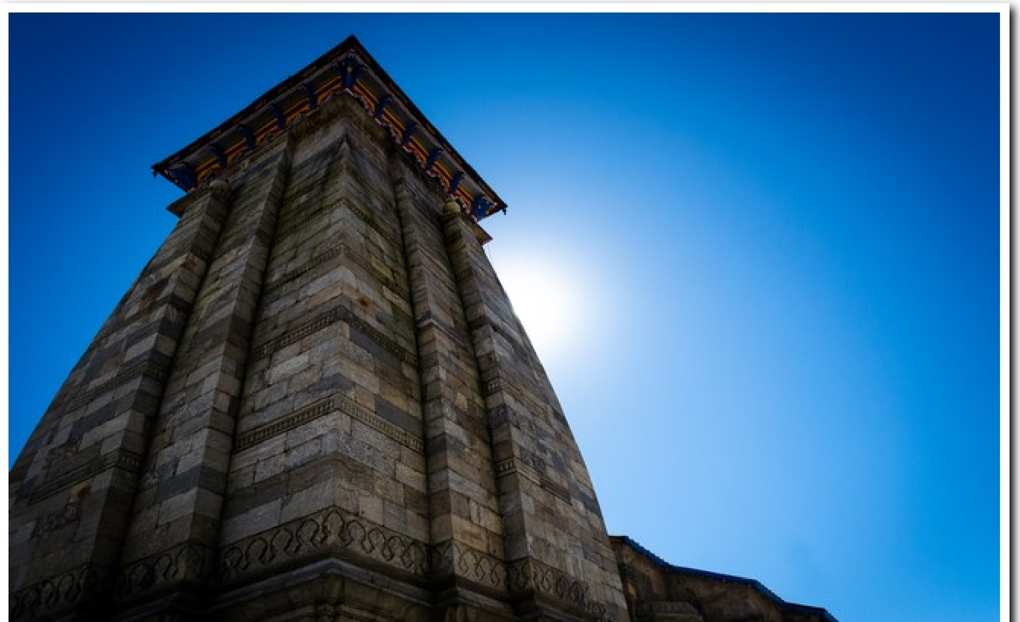

~ কেদারের আরও ছবি ~

জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার টেকনিকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন পাহাড়ে না গেলেই ডিপ্রেশনে ভোগেন। ট্রেকে বেরোলেই ফের চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। কিন্তু ফিরে এসে লিখতে বসলেই আবার ল্যাদ খান। তবে এর পরেও কষ্টেসৃষ্টে যেটুকু লেখেন তা স্রেফ 'আমাদের ছুটি'-র জন্যই। বাড়িতে চমৎকার রুটি বানান। মাঝেমধ্যে রান্না করতেও ভালোবাসেন।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Sign Up to see what your friends like.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

পশ্চিম হুগলী - ঐতিহ্যের খোঁজে

তপন পাল

প্রস্তাবনা
ষাট পেরিয়েছি। শারীরিক সক্ষমতা বা কষ্টসহিষ্ণুতা কমেছে কি না জানিনা, তবে কিঞ্চিৎ কমেছে আত্মবিশ্বাস। আর তার সঙ্গে সমানুপাতিক বেড়েছে আমাকে নিয়ে প্রিয়জনদের উদ্বেগ। তাই হুটহাট করে ট্রেনে বাসে বেরোনো নিষেধ। না বেরোলেই ভাল হয়, তবে যদি যেতেই হয়, গাড়ি নিয়ে সারথি নিয়ে যাও। বাংলায় ল্যাংবোট বলে একটি শব্দ আছে, Long Boat এর অপভ্রংশ এই শব্দটির বাংলা অর্থ 'জাহাজের পিছনে যে নৌকা বাঁধা থাকে' - ব্যঙ্গে নিত্যসঙ্গী অনুচর। ল্যাংবোট নিয়ে বেরোনো মানে বেরোনোর অর্ধেক আনন্দই মাটি, সর্বদা তোমাকে অপর একজনের ইচ্ছা অনিচ্ছা মেনে চলতে হবে। তবু, কী-ই বা আর করা যাবে।

যাত্রা
গরম একটু কমতে, একটু বৃষ্টির পর, জুনের বাইশ তারিখে ভোর ভোর বাড়ি থেকে বেরিয়ে দ্বিতীয় সেতু, সাঁতরাগাছি শলপ পেরিয়ে ডানকুনি। সেখান থেকে বাঁয়ে ঘুরে, রেললাইন আর সরস্বতী নদী পেরিয়ে গুগুলকথিত অহল্যাবাই হোলকার রোড ধরে মশাট খেজুরিয়া পেরিয়ে গজার মোড়। গুগুলমামা বললেও রাস্তায় কোথাও দোকানের সাইনবোর্ডে বা অন্যত্র অহল্যাবাই হোলকার রোড নামটি দেখলাম না। অনেক খুঁজেও মালওয়া রাজ্যের এই রাণীটির (৩১শে মে ১৭২৫ – ১৩ই আগস্ট ১৭৯৫) সঙ্গে এই রাস্তার কোন সম্পর্ক পেলাম না। এর ইতিহাস কারও জানা আছে? জানা থাকলে জানাবেন। গজার মোড় থেকে থেকে কিঞ্চিৎ এঁকেবেঁকে দ্বারহাট্টা; হুগলী জেলার একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে আমাদের দ্রষ্টব্য দ্বারিকচন্ডী মন্দির ও অন্যান্য কয়েকটি মন্দির।

দ্বারহাট্টা
দ্বারহাট্টার দ্বারিকচন্ডী মন্দির হুগলি জেলার প্রাচীনতম মন্দিরগুলির অন্যতম, এমনটিই বই পড়ে জানা ছিল। গিয়ে দেখা গেল ধন্য বাঙালির ইতিহাস চেতনা, বছর তের আগে যারা মন্দিরটির সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করেছিলেন তাঁরাই নিজেদের নাম জাহির করেছেন, বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে মন্দিরের লৌকিক অতীত। পাশে এক শিবমন্দির, সেখানে এক পিসিমা টগর ফুল তুলছিলেন, তাঁকে মন্দিরের বয়স জিজ্ঞাসা করাতে জানালেন তাঁর ওই গ্রামে বিয়ে হয়েছে বাষট্টি বছর হয়ে গেল ('জানোই তো! তখন কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে হত'!), তখন থেকেই তিনি মন্দিরটি দেখছেন। কিঞ্চিৎ ঘাঁটাঘাঁটি করে জানা গেল দ্বারিকাচণ্ডীর পূর্বতন টেরাকোটা অলংকৃত মন্দির মোহিনীমোহন সিংহ রায়ের পূর্বপুরুষ ফতে সিং দ্বারা ১১২৬ বঙ্গাব্দে স্থাপিত। জমিদারবাবু নাকি স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন বর্তমান মন্দিরের দক্ষিণদিকের পুকুরে একটি কাঠামো নিমজ্জিত, তাতে কুশ, গঙ্গামাটি ও গঙ্গাজল দিয়ে প্রতিমা বানিয়ে মন্দির স্থাপন। আশ্চর্যের কিছু নেই, ঠাকুর দেবতারা বড়লোকদেরই স্বপ্ন-টপ্ন দেন, আর গরিবদের দেন দুঃখকষ্ট। পরবর্তীকালে এক পুরোহিত দেবীর অঙ্গহানি করায় মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয়,তারপর থেকে নাকি ঘটেই পূজা হত এবং ঘটের শীষযুক্ত ডাবে দেবীমাহাত্ম্যে অল্পসময়ের মধ্যেই গাছ জন্মে যেত। মন্দিরের বেদীতে শিয়াল প্রস্রাব করাতে মন্দিরটির পুনর্নির্মাণ ও পুনরাভিষেক ১৪১৩ বঙ্গাব্দে। প্রতিষ্ঠাকালে মন্দিরের জন্য যে বাইশ বিঘা জমি ধার্য করা হয়েছিল তার আয় থেকেই নিত্যপূজার খরচ চলে। জমিদার সিংহরায় পরিবার দেবীপূজার দায়িত্বে।

উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত পূর্বমুখী আটচালা রীতির মন্দিরটির বাইরের দেওয়ালে এখন আর কোন টেরাকোটার অলংকরণ নেই; অলিন্দেও যৎসামান্য। গর্ভগৃহের সামনে নাটমন্দির গোছের ঢাকা চত্বর, পিছনে পঞ্চমুণ্ডীর আসন, পাশে দেবীর পুকুর। গর্ভগৃহে নিত্যপূজিতা শ্রীশ্রী দ্বারিকাচণ্ডী চতুর্ভুজা দুর্গা, সঙ্গে লক্ষ্মী,সরস্বতী,কার্তিক ও গনেশ; নেই মহিষাসুর। দুর্গাপুজোর সময় দ্বারিকা চণ্ডীর বলিদান হওয়ার পর চারপাশের দশ-বারোটি গ্রামের পুজোর বলিদান হয়।

সেখান থেকে রাজরাজেশ্বর মন্দির। ১১৩৬ সালে জমিদার সিংহরায় পরিবার কর্তৃক নির্মিত মন্দিরটি বর্তমানে রাজ্য পুরাতত্ত্ব দপ্তরের রক্ষণাধীন। সিংহরায় পরিবার আদতে রাজস্থানের যোধপুরের বাসিন্দা, ষোড়শ শতকে রাজা মানসিংহের বোনের সঙ্গে সম্রাট আকবরের বিবাহে মুসলমানের সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপনের আতঙ্কে এনারা বাংলায় চলে আসেন। উঁচু ভিত্তিবেদীর ওপর প্রতিষ্ঠিত পূর্বমুখী ত্রিখিলান প্রবেশ দ্বারের আটচালা রীতির মন্দিরটির বহির্গাত্রে অনুপম পোড়ামাটির কাজ, তাতে জলযান ও সেনাবাহিনী, নাবিক ও কামানের সহাবস্থান। গর্ভগৃহের সামনে ঢাকা বারান্দা, সিংহরায় পরিবারের কুলদেবতা রাজরাজেশ্বর হেথায় নিত্যপূজিত। সামনে তিনটে আটচালা রীতির ভগ্নপ্রায় মন্দির, সংস্কারের কাজ চলছে। শ্রমিকরা জানালেন সিংহরায় পরিবারের কলিকাতাবাসী বাবু কাজটি করাচ্ছেন।

হরিপাল

সেখান থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে হরিপাল। আমার এক কাকার নাম ছিল হরি পাল, আর আমার এক মাসির শ্বশুরবাড়ি হওয়ার সূত্রে হরিপাল নামটি ছোটবেলা থেকেই আমার শোনা। তখন ভাবতাম আমার কাকার নামেই জায়গাটার নামকরণ, কাকাও দাবি করতেন পুরো হরিপালটাই নাকি তাঁর। হরিপাল নামে এক সেনাপতি সিঙ্গুরের পশ্চিমে হাটবাজার ও দীঘি-সরোবর শোভিত এক গ্রামের পত্তন করে তার নাম রাখেন হরিপাল। এই হরিপালের কন্যা কানেড়ার বীরত্বকাহিনী ধর্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত। গৌড়েশ্বর ধর্মপাল কানেড়ার সৌন্দর্য ও সাহসের খ্যাতি শুনে তাঁর পাণিপ্রার্থী, গৌড়েশ্বরের প্রতাপে ভীত হরিপাল কন্যাদানে সম্মতও; কিন্তু বাধ সাধলো কানেড়া, তার পছন্দ ধর্মপালের তরুণ সেনাপতি মহাবীর লাউসেন। সে এক হইহই কাণ্ড। তবে এখন কাকার জমিদারি দেখতে নয় - বিশালাক্ষী মন্দির, চণ্ডালি মার মন্দির, বুড়ো-মার মন্দির আর রায়পাড়ায় মন্দির দেখতেই আমাদের আসা। আর জানেনই তো, হরিপালের দই ব্রহ্মাস্বাদসহোদর।

বিশালাক্ষীতলায় প্রাচীন বিশালাক্ষী মায়ের মন্দির। প্রতিমা দ্বিভুজা ত্রিনেত্রা রক্তাম্বরী খড়্গহস্তা বিশালাক্ষী। পায়ের কাছে সবুজ গাত্রবর্ণের বেচারা অসুর গরুচোরের মত বসে। মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির (নির্মাণ ১৪০৪ বঙ্গাব্দ) পারাবত পুরীষে মোড়া, সেখানেই কয়েকজন ভোগের পটল কাটছেন। দেখে বিশেষ সাহস হল না, যদি এরা ভোগ খেয়ে যেতে বলেন! তাড়াতাড়ি সেখান থেকে হাওয়া। এই মন্দিরটিও শুনেছিলাম অতিপুরাতন, কিন্তু কিছুই উৎকীর্ণ নেই। কয়েক বছর আগে সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ হয়েছিল, তার আগের কোনো কিছু জানার উপায় নেই। একবার ভারতীয় রেলমুগ্ধ সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনের জন্য শিয়ালদহ স্টেশনের ইতিহাস লেখায় হাত দিয়েছিলাম। তার জন্য প্রয়োজন ছিল বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবা - যথা কলের জল,ডাকবাক্স, ফোনবুথ,ঘোষণার মাইক, বইয়ের দোকান, ওষুধের দোকান ইত্যাদি – কবে থেকে শিয়ালদহ স্টেশনে চালু হয়েছিল তা জানা। জানতে যেখানেই গেছি, কেন জানতে চাইছি তা অতিকষ্টে বোঝানোর পর শুনতে হয়েছিল 'আমি তো এই পোস্টে দু বছর হল এসেছি, তার আগে কী হয়েছে বলতে পারবো না।' এখানেও দেখি সেই অবস্থা।

সেখান থেকে অনেকখানি গিয়ে চণ্ডালি-মার লম্বাটে মন্দির, মন্দির বন্ধ। মনে হল ইনি দশমহাবিদ্যার অন্যতমা মাতঙ্গী নন তো! আবার অনেকখানি গিয়ে বুড়ো-মার মন্দির। বেশ বিস্তৃত মন্দির, নাটমন্দির, প্রাঙ্গণে টগর কামিনী কাঠচাঁপা। পূজা চলছে, বিগ্রহ ফুট দুয়েকের রক্তবর্ণ মাতৃমুখ, তাইতে জ্বলজ্বলে তিনটে চোখ। ইতোমধ্যে এক পশলা বৃষ্টি, আমরা কিছুক্ষণ বসলাম মন্দিরে। জনবিশ্বাসে বিশালাক্ষী-মা, চণ্ডালি-মা ও বুড়ো-মা সহোদরা তিন ভগিনী; একের অদর্শনে অন্যতমা দর্শন অসম্পূর্ণ থাকে।

সেখান থেকে রায়পাড়ার রাধাগোবিন্দ মন্দির কমপ্লেক্সে। রাধাগোবিন্দ মন্দির তখন বন্ধ, দেবতা দিবানিদ্রায়, এবং এই মন্দির কমপ্লেক্সটি পারিবারিক, সাতবাড়ি রায়বংশীয়দের দেবত্র। আমাদের ঘোরাঘুরি করতে দেখে জনৈক প্রস্তাব দিলেন, প্রশান্ত রায়বাবুকে চেঁচিয়ে ডাকুন, তিনি মন্দির খুলে আপনাদের দেখার ব্যবস্থা করে দেবেন। আমার ভরদুপুরবেলা লোককে বিব্রত করতে ইচ্ছা করল না। রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পাঁচিলের বাইরে, দক্ষিণদিকে আটচালা দোলমঞ্চ ও তিনটি উঁচু বেদীর উপর আটচালা ধাঁচের একদরজার শিবমন্দির, দুটি পূর্বমুখী, একটি পশ্চিমমুখী। বহির্গাত্রে পোড়ামাটির কাজ ক্ষয়ে এসেছে। তিনটে শিবমন্দিরের দক্ষিণে ওইরকমই আরও একজোড়া পশ্চিমমুখী ভগ্নপ্রায় শিবমন্দির। আরও দক্ষিণে, চালতাতলা ফুলবাগানে ওইরকমই আরও চারটি শিবমন্দির।

আঁটপুর

সেখান থেকে হাজরা মোড়, সরু গ্রামীণ রাস্তা ধরে আঁটপুর। আঁটপুর হুগলি জেলার একটি গ্রাম; নদীর ধারে আটটি গ্রামের - তড়া, বোমনগর, কোমরবাজার, ধরমপুর, আনারবাটি, রানিরবাজার, বিলাড়া ও লোহাগাছি - সমন্বয়ে গঠিত। কথিত ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজার আট সেনাপতির নিবাস ছিল এই আট গ্রামে – সেই সূত্রেই বিষখালি নাম বদলে হয় আঁটপুর। অতীতে আঁটপুরে হাওড়া-আমতা-চাঁপাডাঙা-শিয়াখালা রুটের ন্যারোগেজ রেলপথের একটি রেলস্টেশন ছিল। আঁটপুর তার টেরাকোটা মন্দিরের জন্য অতিখ্যাত। মন্দিরগুলি এবং রামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রমের জন্য পর্যটকরা এখন আসছেন, গ্রামীণ অর্থনীতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে;তাই গ্রাম হলেও বর্তমানে এটিকে আধা-শহর বলা চলে। এখানকার মুখ্য মন্দির একশো ফুট উঁচু, সাতচল্লিশ ফুট দীর্ঘ ও উনচল্লিশ ফুট প্রস্থের ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত রাধাগোবিন্দজিউ মন্দির। মন্দিরটি আটচালা রীতির, সামনের দিকে দোতালা ছাদের সঙ্গে একটি দালান। মন্দিরটির গায়ে অসাধারণ পোড়ামাটির কারুকাজ, মন্দিরের ভিতের ইট নাকি গঙ্গামাটি ও গঙ্গাজলে তৈরি। বিশ্বাস করলাম না কারণ সেখান থেকে নিকটবর্তী গঙ্গা – বালি বা শেওড়াফুলি বা বৈদ্যবাটি - কমবেশি চল্লিশ কিলোমিটার। টেরাকোটার বিষয়বস্তু অষ্টাদশ পুরাণ, মহাকাব্যদ্বয়, ইতিহাস ও সমকালীন বিষয়বস্তু থেকে আহরিত। রাধাকৃষ্ণ, দুর্গা ও চণ্ডী, যুদ্ধের দৃশ্য - অশ্বারোহী, গজারোহী এবং উটারোহী সৈন্য, কামান-বন্দুক, বাদশা এবং সাহেবরাও সেখানে উপস্থিত। মন্দিরটি বর্তমানে কিঞ্চিৎ ক্ষতিগ্রস্ত; তাই নিরাপত্তার কারণে ভিতরে প্রবেশ বন্ধ। এই মন্দিরটির ঠিক সামনেই প্রায় পাঁচশো বছরের পুরোনো একটি বকুলগাছ; বস্তুত এবারে আঁটপুর আসার প্রথমতম ও প্রধানতম উদ্দেশ্য তিনটি অতি প্রাচীন বকুলগাছ সন্দর্শন; বাকি দুটি ক্রমশ প্রকাশ্য। রাধাগোবিন্দজিউয়ের মূল মন্দিরের উত্তরে তিনশো বছরের পুরোনো কাঁঠাল কাঠের খড়ের ছাউনির চণ্ডীমণ্ডপ, শেষ সংস্কার ১৪২৪ বঙ্গাব্দ। চণ্ডীমণ্ডপটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংরক্ষিত হেরিটেজ তালিকার অন্তর্ভুক্ত। মূল মন্দিরের সামনের মাঠে চারটি আটচালা ও একটি পঞ্চরত্ন মন্দির, রাসমঞ্চ। রাস্তার ওপারেই মস্ত পুকুর, প্রতিষ্ঠা ১২৮৯ বঙ্গাব্দ, কাকচক্ষু জল। তার ঘাটের সিঁড়ির মুখে দুটো আটচালা মন্দির।

এই পরিবারের আদি পুরুষ কন্দর্প মিত্র কোন্নগর থেকে হুগলি জেলার আঁটপুরে বসবাস শুরু করেন। তিনিই ১৬৮৩ খৃস্টাব্দে পুজো শুরু করেন। আগে পুজো হত খড়ের চালের একটি ঘরে। পরে ১৭৪৭-এ আটচালাটি তৈরি হয়। কন্দর্প মিত্রের পৌত্র কৃষ্ণরাম মিত্র এই পরিবারের অন্যতম কৃতী পুরুষ। তিনি ছিলেন বর্ধমানের রাজা প্রতাপচাঁদ এবং উদয়চাঁদ মহতাবের দেওয়ান। সেই সূত্রে জমিদারিও লাভ করেছিলেন। তাঁর সময় থেকেই এই পরিবারের পুজোর জৌলুস বাড়তে থাকে। আগে আটচালাটির ঠিক সামনে কাঁঠালকাঠের একটি নাটমন্দির ছিল। এক সময়ে ঝড়ে তা ক্ষতিগ্রস্ত হলে আর একটি নাটমন্দির তৈরি করা হয়।

পুরনো প্রথা অনুসারে জন্মাষ্টমীর দিনে প্রতিমা নির্মাণের জন্য মাটি তোলা হয়। এক চালার সাবেক রীতির প্রতিমা ঐতিহ্যবাহী শোলার সাজে পূজিতা হন। শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে বোধনের মাধ্যমে পুজোর সূচনা হয়। সে দিন থেকে নবমী পর্যন্ত প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ। নবপত্রিকা স্নান সামনের পুকুরে। কৃষ্ণরাম মিত্র তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি দেবোত্তর করে দিয়ে গিয়েছিলেন। পুজোয় ব্যয়ভার চলে দেবোত্তর এস্টেট থেকে। আজও অব্যাহত কুমারীপুজো ও কনকাঞ্জলি প্রথা। আর পাঁচটি শিবমন্দির - গঙ্গাধর, রামেশ্বর (বড়শিব), বাণেশ্বর, জলেশ্বর, আর ফুলেশ্বর। প্রতিটি শিবমন্দিরের গায়েই টেরাকোটার কারুকাজ।

মন্দিরটি তৈরি করিয়েছিলেন বর্ধমানরাজের দেওয়ান কৃষ্ণরাম; এবং যথারীতি রায়তদের রক্ত নিংড়ে। আমার হয়েছে এই এক জ্বালা, কোন মন্দির মসজিদ স্থাপত্য দেখতে গেলে তার শিল্পসুষমার চেয়ে তার অর্থনীতির দিকে মন বেশি যায়। আমার তো তাজমহলে গেলেও আজকাল বিরক্ত লাগে। একটা দানব, দাদা থেকে ভাই, ভাইপোকে খুন করাল, নিজের বাপের সমাধি বানাল না; উলটে পিসিশাশুড়ি যখন তা বানালেন সুকৌশলে নিজের মাকেও সেখানে ঢুকিয়ে দিল, মেয়ের প্রেমিককে বধ করল, মেয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হল – তবু দেখো তাকে নিয়ে আদিখ্যেতার শেষ নেই। কার পয়সায় তাজমহল হয়েছিল - তার জেরে শাহজাহানের রাজত্বকালে কতবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল – সে খবর কেউ রাখে না।

বাজার থেকে বাঁয়ে কিছুটা গেলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ আঁটপুরের দ্বাদশ গোপাল পরমেশ্বর দাস ঠাকুরের শ্রীপাট। চারপাশে অনেক গাছপালা, যেন তপোবন। এই মন্দিরটির ঠিক সামনেই প্রায় তিনশো বছরের পুরোনো সিদ্ধবকুল; দ্বিতীয় অতি প্রাচীন বকুলগাছ সন্দর্শন।

সেখান থেকে ঘুরে আবার সেই মন্দিরের সামনে দিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির। আঁটপুরে বাবুরাম ঘোষের (পরবর্তীকালে স্বামী প্রেমানন্দ) গ্রামের বাড়ি (বাবুরাম ঘোষের দুর্গাবাড়ি; দুর্গাপূজা হত বলে)। নরেন (তখনও বিবেকানন্দ হননি) আটজন গুরুভাই নিয়ে শীতে এখানে বেড়াতে এসেছিলেন। ১৮৮৬ সালের ক্রিসমাস ইভের দিনে, শুকনো পাতা জ্বালিয়ে হাত পা সেঁকতে সেঁকতে তারা যিশুর জীবন নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তখনই অগ্নিসাক্ষী করে তাঁরা - নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ),বাবুরাম (প্রেমানন্দ),শরৎ (সারদানন্দ),শশী (রামকৃষ্ণানন্দ),তারক (শিবানন্দ), কালী (অভেদানন্দ),নিরঞ্জন (নিরঞ্জনানন্দ),গঙ্গাধর (অখণ্ডানন্দ) এবং সারদা (ত্রিগুণাতীতানন্দ) সন্যাঅভস গ্রহণ করেন। আজ সেখানে হয়েছে ধুনিমণ্ডপ। মণ্ডপের গায়ে নয় সন্ন্যাসীর খোদাই করা মূর্তি। চারপাশে পোড়ামাটির কাজে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী বিধৃত। স্বামী প্রেমানন্দের জন্মস্থান এই বসতবাড়ি রামকৃষ্ণ মিশন অধিগ্রহণ করে ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে, গড়ে ওঠে রামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রম। ক্রিসমাস ইভের প্রতিবছর অনুষ্ঠান হয়। মিশনের সামনের মাঠে ত্রিভঙ্গমুরারী এক প্রাচীন বকুলগাছ, তৃতীয় অতি প্রাচীন বকুলগাছ সন্দর্শন। পাশে মস্ত পুকুর।

রাজবলহাট

আঁটপুর থেকে ৬ কিমি দূরে রাজবলহাট। অতীতের ভুরশুট রাজ্যের রাজধানী ছিল রাজবলহাট। শনিভানগড়ের রাজা চতুরানন্দ নামের এক ব্যক্তির কাছে পরাজিত হন। চতুরানন্দের নাতি কৃষ্ণ রায় ভুরশুট রাজ্য স্থাপন করেন ১৫৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দে। তার বংশধর প্রতাপ নারায়ণ ছিলেন প্রজাপালক ও দাতা প্রকৃতির রাজা। তার পুত্র শিবনারায়ণ,তস্য পুত্র নরনারায়ণ রায় ভুরশুটে রাজত্ব করেন। নরনারায়ণের রাজত্বকালের শেষে বা তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্র ভুরশুট রাজ্য দখল করে নেন। ভুরশুট রাজ্যের রাজধানী রাজবলহাটে তিনটি গড় বা দুর্গ ছিল যদিও বর্তমানে তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়না। ভুরশুট রাজারা পাঁচশো বিঘা জমি দেবী রাজবল্লভীর মন্দিরের সেবায় দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে দান করেছিলেন। রাজবলহাট জায়গার নাম দেবী রাজবল্লভীর নামানুসারেই চিহ্নিত। ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ রাজা রুদ্রনারায়ণ রায় এই মন্দির নির্মান করেন ষোড়শ শতকে। পুনঃপ্রতিষ্ঠা ১৩৪০ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে; নাটমন্দিরটির প্রতিষ্ঠা ১৩৪৬-এর মাঘে। মায়ের নবকলেবর ১৩৮৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখে। উপর্যুপরি সংস্কারে আজ এই মন্দিরের প্রাচীনত্ব বিলীন। ছয় ফুট উচ্চতার রাজবল্লভী কালীবিগ্রহ শ্বেতবর্ণা, পরনে নীল সবুজ বসন, যেন দেবী রিলায়েন্স। গঙ্গামাটি দিয়ে গ্রহ নির্মিত। ত্রিনয়নী মুণ্ডমালিনী দ্বিভূজা বিগ্রহের ডানহাতে ছুরি ও বামহাতে রক্তপাত্র। কালীমূর্তির ডান পা শায়িত শিবের বুকের ওপরে এবং বাম পা বিরুপাক্ষের মস্তকে স্থাপিত। বিগ্রহটি শ্বেতকালিকা নামেও বিখ্যাত। এই মন্দির চত্বরে রাজবল্লভী দেবীর মন্দির ছাড়াও একাধিক মন্দির রয়েছে - শ্রী ত্র্যম্বকেশ্বর শিবমন্দির, শ্রী সোমেশ্বর শিবমন্দির, শ্রী রাজরাজেশ্বর শিবঃ ও শ্রী নন্দীশ্বর শিবমন্দির ও শ্রী বাণেশ্বর শিবমন্দির। সঙ্গে মূর্তিমান রসভঙ্গ ট্র্যাফিক কিয়স্কের ধাঁচের, মন্দির চত্বরের স্থাপত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাযুজ্যবিহীন ভাবে একটি অর্বাচীন শিবমন্দির। আর রয়েছে মায়ের পুকুর। মন্দিরে রোজ ভোগ খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তার জন্য সকাল আটটা থেকে দশটার মধ্যে পঁচিশ টাকা দিয়ে কূপন কাটতে হবে। ভোগ খাওয়া শুরু দুপুর দুটো থেকে।। অন্যতম শাক্তপীঠ হিসেবে পরিগণিত। আমরা যখন গেলাম তখন লোকের ভিড়ে ছয়লাপ, হইহই করে পুজো চলছে। মন্দিরের বহির্গাত্রে লোকজন তাদের ছেলেপিলের রঙিন ছবি টাঙিয়ে দিয়েছে।

রাজবলহাট মন্দিরের লাগোয়া রাজবলহাট দিঘির পাশেই মতিঝিল। পাঁচ বিঘার শতাব্দীপ্রাচীন ওই জলাশয় ব্যবহার করছিলেন আশপাশের চার -পাঁচটি মৌজার মানুষ। সেই জলাশয়ের সঙ্গে ডিভিসির সংযোগ রয়েছে। কিছুদিন আগেও ডিভিসির জল ওই জলাশয় দিয়ে প্রবাহিত হত। রাজবলহাটে একাধিক প্রাচীন টেরাকোটা মন্দির আছে যার মধ্যে আঠেরো শতকে তৈরি রাধাকান্ত, মতান্তরে রাধাগোবিন্দ মন্দির ও শ্রীধর দামোদর মন্দির (শেষ সংস্কার ১৪০১ বঙ্গাব্দ) দেখার মত। মন্দির দুটিই শীলবাটির শীলেদের পারিবারিক, এবং পারিবারিক বাসস্থানের মধ্যে। এখানে অমূল্য প্রত্নশালা নামে একটি সংগ্রহালয় আছে। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাঙলার তালমিছরি শিল্পের জনক দুলাল চন্দ্র ভড়ের বাড়িও রাজবলহাট। রাজবলহাটের রসগোল্লা দেবপ্রতিম।

ফুরফুরা শরিফ

রাজবলহাট থেকে জাঙ্গিপাড়া হয়ে কানা দামোদর পেরিয়ে ফুরফুরা শরিফ পনের কিলোমিটার, আধ ঘণ্টার পথ। পথে পড়ল রাসপুর, ও এন জি সি এখানে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন, না মেলায় সব ছেড়েছুড়ে দেশ ছেড়েছেন। পড়ে আছে বাড়িঘর। মনে পড়ল গতবছর এই সময়েই অশোকনগর পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বাইগাছি এলাকায় ও এন জি সির প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধান দেখতে গিয়েছিলাম।

ফুরফুরা শরীফের হজরত দাদাপীর সাহেব ছিলেন একজন সুপ্রসিদ্ধ ইসলামি পণ্ডিত ও ধর্মগুরু। তিনি ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলিম, জাতিধর্ম নির্বিশেষে তৎকালীন বাংলা ও অসমের বহু মানুষকে নিজের মুরিদ বা শিষ্য করেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ আভিজাত্যপূর্ণ চেহারা ও অসাধারণ ধর্মীয় পাণ্ডিত্য সমকালীন জ্ঞানীগুণী থেকে সাধারণ মানুষদের তীব্র আকর্ষণ করত। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই মার্চ শুক্রবারে প্রায় একশ বছর বয়সে দাদাপীর সাহেব ইন্তেকাল বা দেহরক্ষা করেন। তাঁর মৃত্যুর দিনটিকে কেন্দ্র করে তাঁর সমাধি-দরগাহে প্রতিবছর বাৎসরিক উৎসব ও মেলা বসে বাংলা বর্ষপঞ্জীর ফাল্গুন মাসের ২১, ২২ ও ২৩ তারিখ। ফুরফুরায় অসংখ্য ওলি, গাউস, কুতুব, আবদাল, মাওলানা, মৌলভি ও আলিমে দ্বীন সুফি সাধকের মাজার শরিফ আছে।

প্রত্যাবর্তন

ফেরার পথে ফুরফুরা শরীফ থেকে শিয়াখালা, সেখান থেকে মশাট হয়ে পুরনো রাস্তাতেই ডানকুনি। এই রাস্তাতেই কলকাতা যাওয়ার পথে ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাইলস্টোন দেখে ইংরাজি সংখ্যা শিখেছিলেন। তাঁর স্মরণে গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা পথ হাঁটা হল। নিবেদিতা সেতু পেরিয়ে পরিশেষে বাড়ি ।

পথনির্দেশ

কিভাবে যাবেন? হাওড়া থেকে আরামবাগ/ তারকেশ্বর/ হরিপাল/ তালপুর লোকাল ধরে হরিপাল স্টেশনে নেমে ১০ নম্বর বাসে অথবা সুকান্তপার্কগামী ট্রেকারে আঁটপুর মঠ। অথবা হরিপাল স্টেশন থেকে ৯ বা ৯এ বাসে তড়ার মোড় স্টপেজে নেমে পাঁচ মিনিট হেঁটে। ওই একই বাস/ট্রেকারে দ্বারহাট্টা (রামহাটিতলা স্টপেজ) যাওয়া যায়। কোলকাতা থেকে নিজস্ব গাড়িতে এলে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে সিঙ্গুর। সেখান থেকে বাঁদিকে ১২ নম্বর বাস রাস্তা ধরে (তারকেশ্বরমুখী) মালিয়া পার্ককে বাঁদিকে ফেলে একটু এগোলেই গোপীনগর চৌমাথা থেকে বাঁ দিকে দু কিমি এগোলেই হরিপাল। হরিপাল থেকে ৯-১০ বাস রাস্তা হয়ে আঁটপুর। আবার ডানকুনি থেকে ২৬ নম্বর বাস রাস্তা ধরে চণ্ডীতলা-মসাট-শিয়াখালা পেরিয়ে গজার মোড়। গজার মোড় থেকে বাঁ-হাতে ৯-১০ বাস রাস্তা ধরে আঁটপুর। দ্বিতীয় হুগলী সেতু পেরিয়ে বম্বে রোড ধরে সলপ।

সলপ থেকে বাঁ দিকে ডোমজুড়-বড়গাছিয়া-জাঙ্গিপাড়া হয়ে আঁটপুর। এবার আপনার ইচ্ছে...

কেনাকাটা
আর হ্যাঁ! ধনেখালি তাঁতের শাড়ি কিনতে হলে দ্বারহাট্টা/আঁটপুর/রাজবলহাটে সরাসরি তাঁতির বাড়ি চলে যান,ঘরে ঘরে তাঁত চলছে, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে শুনতে পাবেন ঘরে ঘরে তাঁত চলার টকাটক আওয়াজ। অভাবনীয় কম দামে মিলতে পারে আপনার পছন্দের গামছা বা শাড়িটি। চা মুড়িও জুটতে পারে। ধনেখালি তাঁতের আসল আঁতুড় ঘর হল রাজবলহাট।

আহার
পরিশেষে আহার। রাজবল্লভী মায়ের ভোগ বা আঁটপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ভোগ খেয়ে নিন। মধ্যে মধ্যে নিরামিষ খাওয়া ভাল।

লেখাটির এমন নাম দেওয়ার কারণ হুগলী বলতে আমরা সাধারণত হুগলী নদীর তীরবর্তী উত্তরপাড়া থেকে বৈঁচি অবধি বুঝি, বড়জোর গুড়াপ থেকে ডানকুনি। তার পশ্চিমে বিস্তৃত যে হুগলী - তারকেশ্বর পুরশুড়া আরামবাগ খানাকুল গোঘাট... তা আমাদের কাছে অনেকখানিই অচেনা।

হিসাবশাস্ত্রের স্নাতকোত্তর শ্রী তপন পাল West Bengal Audit & Accounts Service থেকে অবসর নিয়েছেন সম্প্রতি। তাঁর উৎসাহের মূলক্ষেত্র রেল - বিশেষত রেলের ইতিহাস ও রেলের অর্থনীতি। সে বিষয়ে লেখালেখি সবই ইংরাজিতে। পাশাপাশি সাপ নিয়েও তাঁর উৎসাহ ও চর্চা। বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য শ্রী পালকে বাংলা লিখতে শিখিয়েছে 'আমাদের ছুটি'। স্বল্পদূরত্বের দিনান্তভ্রমণ শ্রী পালের শখ; কারণ 'একলা লোককে হোটেল ঘর দেয় না'।

কেমন লাগল : - select -
Like Sign Up to see what your friends like.
tell a Friend
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

চেনা অচেনা হাম্পি

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

~ হাম্পির আরও ছবি ~

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি হাম্পি দেখার ইচ্ছা ছিল অনেক দিন থেকেই। সেটা দেখার একটা সুযোগ আসতেই তা হাতছাড়া করলাম না। হাম্পির ট্রেডমার্ক বিটঠালা মন্দিরের 'পাথরের রথ'এর ছবি বই আর পত্রপত্রিকায় প্রায়ই প্রকাশিত হয়। এখন আবার ইন্টারনেটের যুগ, তাই এই রথের অজস্র ছবি সেখানেই মিলে যায়।

বিটঠালা মন্দিরের কাছেই উদ্ধার হয়েছে বহু প্রাচীন পোড়ামাটির পাত্রের টুকরো। সম্রাট অশোকের শিলালিপি পাওয়া গেছে নিতুর আর উদে-গোলাম-এ। এই স্থান যে সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তা সন্দেহাতীত।

হাম্পির নাম পম্পা ক্ষেত্র, কিষ্কিন্ধ্যা ক্ষেত্র বা ভাস্কর ক্ষেত্র। তুঙ্গভদ্রা নদীর প্রাচীন নাম পম্পা। রামায়ণে বর্ণিত কিষ্কিন্ধ্যা হাম্পির খুব কাছেই বলে মনে করা হয়। সেকালে এই কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের রাজা ছিলেন বালি আর সুগ্রীব। বালির কাছে মার খেয়ে সুগ্রীবের ঠিকানা হয়েছিল মাতঙ্গ পর্বত। রামায়ণের কাল থেকেই এই অঞ্চল অতি প্রসিদ্ধ। সাধে কী এই অঞ্চলকে বেছে নিয়েছিলেন শরদিন্দুবাবু 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' লিখবার জন্য।

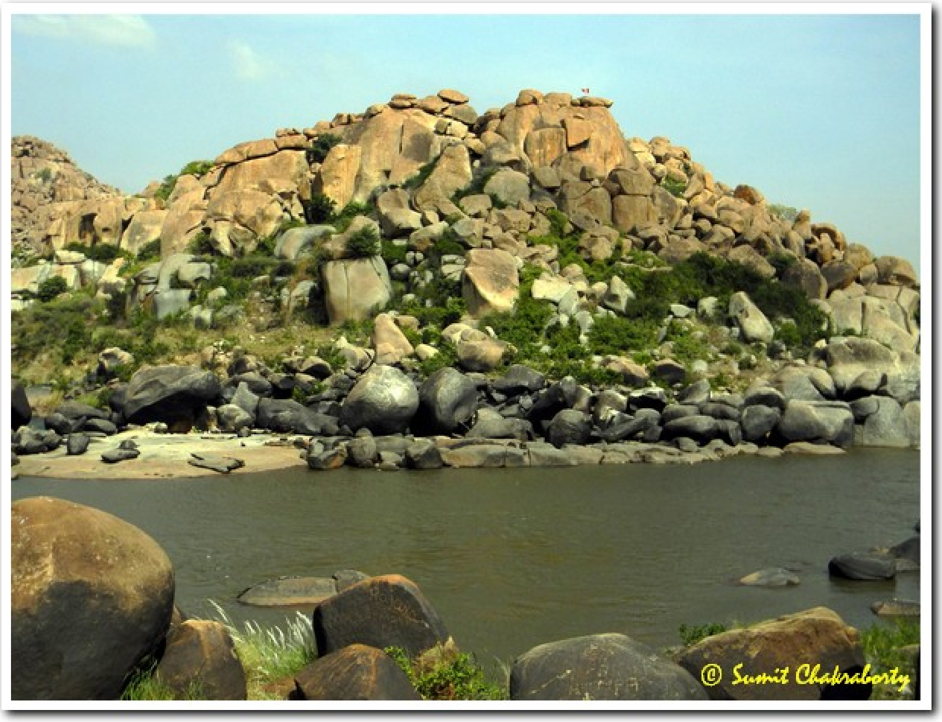

হাম্পি বাসকালে এক সকালে আমাদের গন্তব্য হয়েছিল 'হেমকূট পর্বত'। শীতের সকালের সোনালী আলোয় হেমকূটের ভগ্ন এবং পরিত্যক্ত মন্দিররাজির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে মনটা বার বার পিছনের দিকে ছুটে চলে যাচ্ছিল। চোখে পড়ল একটা বড় পাথরের গায়ে কোন এক অজানা শিল্পী 'রামায়ণের কাল'কে ধরে রেখেছেন। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা দেবীর সঙ্গে বীর হনুমান।

পাথরের গায়ে সারিবদ্ধ ভাবে ছোট ছোট গর্ত করা রয়েছে। এই গর্তে তেল আর সলতের সাহায্যে বাতি জ্বালানো হত। দিবাশেষে সূর্যদেব পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হলে আঁধার নেমে আসত। জ্বলে উঠত সারি সারি আলো। পাহাড়ের ওপরের এই সারিবদ্ধ আলো নিশ্চয় অনেক দূর থেকে দেখা যেত। তা ভাবতেই মনটা কোথায় যেন হারিয়ে যায়, সেই স্বপ্নরাজ্যে। ভাবি এমনটা কেন আর দেখি না!

সকালের সোনালী আলোয় হেমকূট পর্বতের ওপরে ঘুরে বেড়াতে বড়ই আনন্দ হচ্ছিল। পাহাড়ের ওপর থেকে চারপাশে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। একটা বড় পাথরের ওপর সূর্যের আলো পড়ে পাথরটিকে শ্রীময় করে তুলেছিল। পাথরটির গায়ে হাত ছোঁয়াতেই মনে হল ও যেন বলে উঠল – 'তুমি কি রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের নাম শুনেছ? উনিও মাঝে মাঝে এখানে এসে দাঁড়াতেন। আমার সঙ্গে অনেক কথা হতো। আমি এই পাহাড়ের উপর থেকে অনেক কিছু দেখতে পাই। ওঁকে সে সব কথা বলতাম। কিন্তু উনি বেশি দিন থাকতে পারলেন না।' এই বলে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। আর কোনও কথা শুনতে পেলাম না। আমার এক সঙ্গী এসে পৌঁছাতেই অন্যমনস্ক ভাবটা কেটে গেল। মনে হল স্বপ্নটা যেন ভেঙে গেল।

রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের কথা মনে পড়ল। কুড়ি বছর রাজত্ব চালিয়েছিলেন। পণ্ডিতদের মতে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কৃষ্ণদেব রায়। তাঁর শেষ জীবনটা অবশ্য বড়ই দুঃখে কেটেছিল। শিশুপুত্রকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন,কিন্তু তার অকালমৃত্যু (বিষ প্রয়োগে) রাজাকে মানসিক ভাবে কিছুটা হলেও অশক্ত করেছিল।

হরিহর ও বুকার হাত ধরে যে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পত্তন হয়েছিল ১৩৩৬ সালে, তার অনেক পরে সিংহাসনে বসেছিলেন রাজা কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯)। তাঁর রাজত্বকালে পর্তুগাল থেকে একাধিক মানুষ বিজয়নগর এসেছিলেন। তাঁদের একজন ডোমিঙ্গস পেস। রাজা কৃষ্ণদেব রায় কেমন মানুষ ছিলেন, কী ভাবে তাঁর দিন শুরু হত, প্রভাতকালে রাজা কী করতেন, এইসব বিবরণ ডোমিঙ্গস পেস লিখে গেছেন। হাম্পির আর্কিয়োলজি মিউজিয়মে ওঁর লেখার সামান্য কিছু অংশ প্রদর্শিত হয়েছে। এই লেখা পড়লে বোঝা যায় কী অসাধারণ শক্তির অধিকারী ছিলেন রাজা কৃষ্ণদেব রায়।

দিনের আলো ফোটার অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়তেন রাজা। সারা দেহে তেল মেখে কোমর স্বল্পবস্ত্রে আবৃত করে একহাতে খুব ভারী মাটির গদাজাতীয় কিছু নিয়ে অপর হাতে তলোয়ার নিয়ে ব্যায়াম করতেন। শরীর ঘর্মাক্ত হলে একজন কুস্তিগীরের সঙ্গে কুস্তি লড়তেন। তারপর ঘোড়ায় চড়ে তীব্র গতিতে একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত ছুটে বেড়াতেন। ভোর হলে স্নান করে মন্দিরে যেতেন। প্রাত্যহিক দেবার্চনা সমাপন করে তবে রাজসভায় গিয়ে বসতেন। যে মানুষের দিন শুরু হত এমনভাবে তিনি যে অনন্যসাধারণ পুরুষ ছিলেন তা আর বলে দিতে হয় না।

সকালে দুর্গামন্দির, মাতঙ্গ পর্বত ইত্যাদি দেখে তুঙ্গভদ্রা নদী পেরিয়ে অপর দিকে এসে বেশ কিছুটা হেঁটে বিজয় বিট্ঠালা মন্দিরের দিকে চলেছি। মন্দিরের কাছে পৌঁছতে সকাল পার হয়ে দুপুর গড়িয়ে গেল। বিট্ঠালা মন্দিরে না ঢুকে পাশের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলি কয়েকটা প্রাচীন অথচ পরিত্যক্ত মন্দির দেখবার জন্য।

বিটঠালা মন্দিরের পাশ দিয়ে যেতেই মনে পড়ছিল প্রায় ছশো বছর আগেকার কথা। অসাধারণ সুন্দর এই মন্দিরচত্বরের মূল মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শরদিন্দুবাবুর 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসের নায়ক রাজা দ্বিতীয় দেবরায়। এর অনেক পরে রাজা কৃষ্ণদেব রায় মন্দিরচত্বরে কয়েকটি মন্দির যোগ করেন এবং মন্দিরের বর্তমান রূপ প্রদান করেন বলে জানিয়েছে একটি সূত্র। অবশ্য পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মুস্কিল এটাই, পণ্ডিতরা কিছুতেই একমত হন না। নানা মুনির নানা মত। তাই আমাদের মতো সাধারণ মানুষের হচ্ছে মুস্কিল। তবে আমরা ধরে নিচ্ছি রাজা দ্বিতীয় দেবরায় বিটঠালা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

বিটঠালা মন্দিরকে ডানদিকে রেখে মাটির পথ ধরে সামান্য এগিয়ে গেলেই রাস্তাটি দুটি ভাগ হয়েছে। বাঁদিকের রাস্তাটি কম্পভূপা পথ নামেই খ্যাত। এক পথের শুরুতেই এবং বিটঠালা মন্দিরের উত্তর পশ্চিম কোণে রয়েছে ১৫ ফুট উঁচু একটি পাথরের তুলাদণ্ড। রাস্তাটি ধরে টিলার উপর দিয়ে এগিয়ে গেলেই পৌঁছানো যায় তুঙ্গভদ্রা নদীর কিল্লাঘাটে, ১৩৫২ শকাব্দের বৈশাখ মাসের শেষ বিকালে এখানেই এসে পৌঁছেছিলেন কলিঙ্গদেশের রাজকন্যা কুমারী ভট্টারিকা বিদ্যুৎমালা এবং তাঁর বোন মণিকঙ্কণা। সেদিনের কালবৈশাখীর ঝড়ে এই দুই কন্যার জীবন ওলটপালোট হয়ে যায়। শরদিন্দুবাবুর উপন্যাস পড়ে সেদিনের কাহিনি সকলের জানা।

রাজগুরু আর্য কূর্মদেব রাজার বিবাহানুষ্ঠান তিনমাস পিছিয়ে দিয়েছেন। আর কুমারীদ্বয়কে প্রতিদিন সকালে স্নান সেরে পম্পাপতির মন্দিরে পূজা দেবার নিদান দিয়েছেন। এইসব নানা ঘটনার কথা ভাবতে ভাবতে কম্পভূপা পথের এক প্রান্তে অবস্থিত 'রাজার তুলাদণ্ড'-এর পাশ দিয়ে অনেকটা পথ কখন যে পেরিয়ে এসেছি তা আর বুঝতে পারি নি। সূর্যদেব মাথার উপরে অগ্নিবর্ষণ করছেন। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। পাহাড়ি পথ জনশূন্য। ছোট ছোট ভাঙ্গা মন্দিরগুলি রাস্তার ধারে পড়ে রয়েছে। মন্দিরে আজ আর দেবসেবা হয় না। জন্মেছে আগাছা, ছাদ ভেঙে পড়ছে। এমন একটা মন্দিরে এসে বসে পড়েছি। শরীর আর চলছিল না। একটা স্তম্ভে ঠেস দিয়ে বসেছিলাম। কতক্ষণ জানি না।

শুনতে পাচ্ছিলাম কয়েকজনের কণ্ঠস্বর। তারা আলোচনা করছে রাজগুরু আচার্য কূর্মদেব শ্রাবণ মাসে রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের বিবাহের দিন ঠিক করেছেন। এই কয়েকটা দিন রাজাকে কায়িক পরিশ্রম কম করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। রাজপ্রাসাদ ছেড়ে দূরে পরিভ্রমণ না করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিবাহের আগে যেন কোন অঘটন না ঘটে। তাছাড়া রাজাকে তাঁর পছন্দমত খাবার এবং স্নেহজাতীয় খাদ্য বেশি দেওয়া হচ্ছে। যাতে এই কয়েক সপ্তাহে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে এমনকী কিছুটা ওজন বৃদ্ধি হলেও ক্ষতি নেই। বিবাহের ঠিক পূর্বে রাজাকে তুলাদণ্ডে বসিয়ে রাজভাণ্ডার থেকে এনে সমপরিমাণ রত্ন, মণিমুক্তা, সোনার গহনা ইত্যাদি দিয়ে ওজন করা হবে। সেই রত্নরাজি রাজা দান করবেন পম্পাপতি মন্দিরের পুরোহিতদের। এটাই রাজকীয় রীতি। এই রাজকীয় প্রথার কথা জেনে এতোটাই অবাক হয়েছিলাম যে মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ বের হয়েছিল হয়তো।

হঠাৎ মৃদু ধাক্কায় চোখ খুলে দেখি অল্পবয়সী একজন স্থানীয় ব্যক্তি ঝুঁকে পড়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বলল,কেয়া হুয়া বাবুজি? হাত নেড়ে জানালাম, না, কিছু হয়নি। বুঝলাম,আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম নিশ্চয়। পৌঁছে গিয়েছিলাম রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের কালে। দুঃখ হচ্ছিল রাজার বিয়ের অনুষ্ঠানটা আর আমার দেখা হল না!

হাম্পিবাসের শেষদিনে সকাল-সকালই বের হয়েছিলাম আমরা। গন্তব্য একবারে তুঙ্গভদ্রা নদী পেরিয়ে মাতঙ্গ পর্বত, তবে তার আগে দুর্গাদেবীর মন্দিরে দেবীদর্শন হয়েছে। কিছুটা দূর থেকে পর্বত দেখে যাওয়া হল পম্পা সরোবর। পাশেই লক্ষ্মী দেবীর মন্দির। সরোবরের পাশে অস্থায়ী আস্তানা গেড়েছে অনেক মানুষ। মনে হল রাজস্থানবাসী। পম্পা সরোবরের পাশে ঝোপঝাড়ে তাই পা ফেলাই যাচ্ছে না! সেই সঙ্গে পদ্মগন্ধ!

অটোচালক-কাম-গাইড শ্রীমান ভিজ্জি/বিজ্জু তুঙ্গভদ্রা নদীর ধারে পৌঁছে দিয়ে আমাদের মোটর-চালিত নৌকায় নদী পেরিয়ে কিছুটা হেঁটে বিটঠালা মন্দিরের কাছে চলে যেতে উপদেশ দিল। জানাল,রাস্তা ধরে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। আমরাও তাই তুঙ্গভদ্রা পেরিয়ে ওপারে চলে এলাম।

আমার গতি মন্থর, তাই সকলের পিছনে পড়েছি। নজরে এল রাস্তার ধারে ভাঙা মন্দির। সামান্য কিছুটা দূরে সরকারি বাস দাঁড়িয়ে ছিল। সেটি ঘুরে চলে গেল। বুঝলাম এই ফেরীঘাট পর্যন্ত বাস আসে।

রাস্তার ধারে খাকি পোশাকে একজন দাঁড়িয়ে। আমাদের ভাঙা মন্দিরের ছবি তুলতে দেখে কী যেন বলল। হিন্দির সঙ্গে স্থানীয় ভাষার মিশ্রণে খিচুড়ি ভাষায়। আমার বোধগম্য হল না কিছু। মনে হল বলছে,পাশের জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে কিছু দেখার আছে। পাশে আমাদের এক সঙ্গী ছিলেন। জানালেন,লোকটি বলছে পাহাড়ের গায়ে ভৈরব রয়েছেন। আমি তো এক পায়ে খাড়া!

আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল লোকটি। আমরা চলেছি তার পিছু পিছু। ঝোপঝাড় কাঁটা গাছে ভর্তি জায়গাটি। এবার শুরু হল বড় বড় পাথর টপকানো। বড় পাথরের ওপর ওঠা এই বয়েসে আমার পক্ষে একটু অস্বস্তির তো বটে। তা ছাড়া টাল সামলাতে না পারলে...

বেশ কয়েকটি পাথর টপকে কিছুটা উপরে উঠে দেখতে পেলাম একটি পাথরের গায়ে মূর্তি খোদাই করা রয়েছে। জায়গাটিতে দু-তিন জন দাঁড়াতে পারবে। সেখানে পৌঁছে মূর্তিটিকে ভালো করে লক্ষ্য করছি। হঠাৎ কার যেন কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। মনে হল দূর থেকে কেউ আমাকে ডাকছে মৃদু অথচ গম্ভীর স্বরে। এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে একটু অবাক হলাম। এবার স্পষ্ট শুনলাম, তুই কী ভাবছিস? আমি তোকে ডাকছি।

একটু সাহস পেয়ে জবাব দিলাম, তুমি কি কিছু বলছ? ভৈরব জানাল, এখানে আমি একা পড়ে রয়েছি সেই কত কাল ধরে। কেউ তো আর আসে না। একমাত্র 'বাবু' আমার কাছে মাঝে মাঝে এসে চুপ করে বসে থাকে। সে-ই তোদের এখানে ডেকে নিয়ে এসেছে। বুঝলাম ভৈরব কার কথা বলছে। আর্কিওলজি বিভাগের যে সাধারণ চাকুরে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে ভৈরব তার কথাই বলেছে।

একটা কথা জানার ইচ্ছা হচ্ছিল। নিজেকে সামলাতে পারলামনা। জিজ্ঞাসা করলাম, ভৈরবের পাঁচটা মুখ, মাথায় জটা আর দেহে সাপের অলঙ্কার থাকে। সেসব তো কিছু দেখতে পাচ্ছিনা। উত্তর পেলাম সঙ্গে সঙ্গেই, হ্যাঁ,ঠিক বলেছিস। তুই তো জানিস শিব পঞ্চানন, জটাধারী। আর সারা অঙ্গে সাপ ঘুরে বেড়ায়। তবে যে ছেলেটি আমাকে এখানে এনেছে, সে আমাকে যেমন ভাবে ভেবেছে আমি তাই-ই! বুঝলাম ভৈরব শিল্পীর কথা বলছেন।

আবার বলতে শুরু করল ভৈরব, তখন তো চারপাশ অন্য রকম ছিল। অনেকেই এখানে আসত। আমার ভালো লাগত। একদিন এমন সব ঘটনা ঘটল না, কী আর বলব, সবকিছু পাল্টে গেল। তবে আমি পাহাড়ের আড়ালে রয়েছি,তাই আমার অসম্মান হয়নি। এরপর আর কিছু শুনতে পেলাম না।

বুঝলাম ভৈরব কী বলল। ১৫৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারির কথা, দক্ষিণভারতের সুলতানদের সম্মিলিতভাবে বিজয়নগর আক্রমণের কথা। তালিকোটার সেই যুদ্ধে সেদিন হাম্পিসহ বিজয়নগর রাজ্যের পতন ঘটে। এই ঘটনায় সবকিছু পাল্টে যায়। ধ্বংস করা হয় হাম্পি। মানুষজন এখান থেকে পালিয়ে গেল। মারা পড়ল অনেকে। ভাঙল অনেক দেবালয়। এখন হাম্পি একটি ধ্বংসস্তূপ। দেশবিদেশ থেকে লোকজন এটাই দেখতে আসে।

দেবদেবীর চেহারা বিষয়ে আমি একেবারে অজ্ঞ। পৌরাণিক অভিধান বলছে,পুরাকালে অন্ধকাসুরের সঙ্গে যখন মহাদেবের যুদ্ধ হয়েছিল, তখন অন্ধক মহাদেবের মস্তকে পদাঘাত করলে মস্তক চারভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং নির্গত রক্তধারা থেকে ভৈরবের জন্ম হয়। এটাই সব নয়। কালিকাপুরাণমতে নন্দী, ভৃঙ্গী, মহাকাল ও বেতাল - এরাও শিবের ভৈরব।

অপরমতে, ভৈরব শিবের একজন পার্ষদ। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু একবার গর্বিত হয়ে মহাদেবকে অপমানিত করলে মহাদেব ক্রুদ্ধ হন। মহাদেবের ক্রোধ থেকে ভৈরবের জন্ম হয়। জন্মানোর পরপরই তিনি দেবতাদের পরাজিত করেন।

এটা ভৈরব কি ভৈরবের মূর্তি নয় সেসব ভাবতে আমার ইচ্ছা হল না। তবে পাহাড়ের গায়ে খোদাইকরা মূর্তিটি দেখে মন ভরে গেল। আর্কিওলজিকাল সার্ভের এই মানুষটি আমাদের এটি না দেখালে কোনোদিন জানতে পারতাম না এই ঝোপঝাড়ের মধ্যে এমন সুন্দর একটি মূর্তি রয়েছে।

হাম্পিতে এসে অনেক অজানাকে দেখা হল। আবার অনেকটাই অজানা রয়ে গেল। তবে যেটুকু দেখলাম সে সব কোন দিনই ভুলতে পারবনা।

~ হাম্পির আরও ছবি ~

প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়ের নেশা বেড়ানো আর ছবি তোলা। বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা চোখের আড়ালে চলে যাওয়া টেরাকোটার মন্দিরশিল্পকে ক্যামেরার দৃষ্টিতে পুনরুদ্ধার করাই তাঁর ভালোলাগা। পাশাপাশি চলে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ভ্রমণ ও অন্যান্য লেখা।

☆☆☆☆☆

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Sign Up to see what your friends like.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বাংরিপোসির বৃত্তান্ত

সন্দীপ পাল

নিজে গাড়ি চালিয়ে লংড্রাইভে যাওয়ার আলাদা একটা মজা আছে। এর আগে আমার দৌড় ছিল দুর্গাপুর (১৫০ কিলোমিটার) ও মায়াপুর ইস্কন (১১৮ কিলোমিটার) অবধি। এবারে সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে গন্তব্য উড়িষ্যার বাংরিপোসি (২৪৫ কিলোমিটার)। সব গুছিয়ে, বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় তালা লাগিয়ে বেরোতে বেরোতে সাড়ে ছটা। পর্যাপ্ত পরিমাণে জল ও প্রাতরাশ সঙ্গে নিয়েছিলাম যাতে রাস্তায় বিশেষ সময় নষ্ট না হয়।

প্রথমে চন্দননগর থেকে দিল্লি রোড ধরে ডানকুনি। সেখান থেকে হাওড়ার মধ্যে দিয়ে গাড়ি ছুটল। ধুলাগড়ের কাছে একশ টাকা টোলট্যাক্স। তারপর উলুবেড়িয়া, বাগনান, দেউলটির পর রূপনারায়ণের ওপর সেতু পেরিয়ে কোলাঘাট। প্রথম দুঘন্টায় ৮০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে কোলাঘাটে খানিক চাবিরতি। আমার কাকা ওখানকার বাসিন্দা, দেখা করতে চলে এল। খানিক আড্ডা দিয়ে আবার পথ চলা শুরু। এরপর পাঁশকুড়া, ডেবরা পেরিয়ে সোজা খড়্গপুর। ডেবরাতে ষাট টাকা টোল ট্যাক্স। খড়্গপুরের কাছে বেশ খানিকটা রাস্তার হাল খুব খারাপ। মুম্বাই রোড (৪৯ নম্বর জাতীয় সড়ক) ধরে গাড়ি এগিয়ে চলেছে - গজাশিমুল,ফেকো-র পর পশ্চিমবঙ্গের সীমানা পেরিয়ে পড়লাম ঝাড়খন্ডে। এরপর বাহারাগোড়া মোড় থেকে বাঁদিকে গাড়ি ঘোরালাম। এখান থেকে বাংরিপোসি ২৯ কিলোমিটার। মাঝে সুবর্ণরেখার ওপর সেতু পেরিয়ে উড়িষ্যায় এলাম। রিসর্টে যখন পৌঁছলাম ঘড়িতে সাড়ে বারোটা বাজে। গাড়ি রিসর্টে ঢুকিয়ে ওডোমিটারে দেখলাম ২৪৫ কিলোমিটার পাড়ি দিয়েছি ছ' ঘন্টায়।

সিমলিপাল খৈরী রিসর্ট

আমরা ঘর বুক করেছিলাম খৈরী রিসর্টে। ৪৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ঠিক পাশেই রিসর্টটি। জাতীয় সড়ক সোজা উঠে গেছে সামনের ঠাকুরানী পাহাড়ে। বাঁহাতে একটা বড় পুকুর, আর ডানহাতে রিসর্টের সদর দরজা। এসি,নন-এসি মিলিয়ে সাকুল্যে চোদ্দটি ঘর আছে। এসি ঘরভাড়া ১৫০০ টাকা, নন-এসি ১০০০ টাকা। গাড়ি রাখার অনেক জায়গা। রিসর্টের বাগানটি বেশ গোছানো। দেখে বোঝা যায় কিছু ঘর বেশ পুরোনো, কয়েকটি যদিও পরবর্তীকালে নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। রিসর্টটি বহুদিন ওটিডিসি-র দ্বারা পরিচালিত হলেও বছর সাত-আটেক হল স্থানীয় এক অধিবাসী রিসর্টটির মালিক ও তিনিই রিসর্টটি লোক দিয়ে চালান।

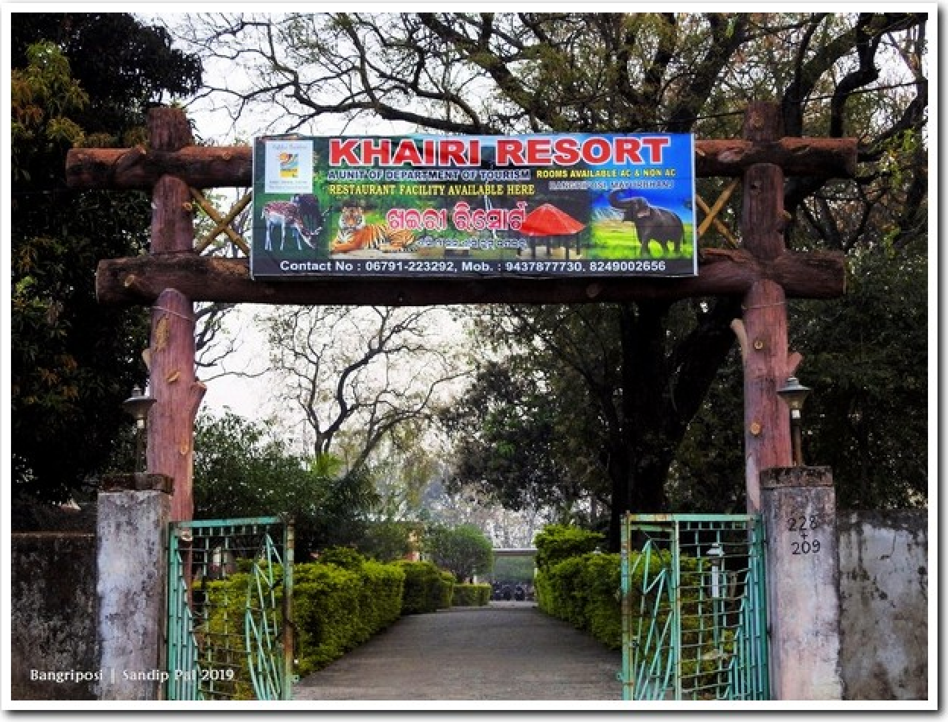

প্রচন্ড খিদে পেয়ে গিয়েছিল। দুপুরে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজন করব, ফোনে বলে রেখেছিলাম। খাবারের টেবিলে বসতেই সামনে এল গরম ভাত, সাথে আলুচোখা, ডাল, ফুলকপির বেশ সুন্দর তরকারি, ডিমের কারি, চাটনি ও পাঁপড়। খাবার বেশ সুস্বাদু। ডাইনিং রুমের ঠিক পাশেই রান্নাঘর। প্রত্যেকবার রান্না করে গরম গরম দিতেই দেখেছি। রাতে চিকেনকষার স্বাদও দুর্দান্ত ছিল।

ঘন্টা দুয়েক বিশ্রাম নিয়ে বিকেল চারটে নাগাদ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যাব বিসই নামে একটি গ্রামে, সেখানে প্রতি শনিবার হাট বসে। রিসর্ট থেকে বিসই ১৬ কিলোমিটারের পাহাড়ি পথ। গাড়ি ঠাকুরানী পাহাড় অভিমুখে চলতে শুরু করল। রাস্তার দুপাশে পলাশ,শিমুল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। যদিও বাংরিপোসিতে শিমুলের আধিক্য বেশি চোখে পড়েছে। সামনের রাস্তা পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে। এই প্রথমবার আমার পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা - একেই পাহাড়ি চড়াই,তার ওপর আঁকাবাঁকা রাস্তায় গাড়ি চালাবার আলাদা একটা রোমাঞ্চ আছে। পথে চোখে পড়ল মা দ্বারসুনি মন্দির। বিসই থেকে রাস্তা দুভাগ হয়ে যায়। সোজা গেলে যাওয়া যেতে পারে বাঁকাবাল ও সেখান থেকে সুলাইপাত বাঁধ এবং জলাধার। বাঁকাবাল জলাধারের কাছাকাছি পৌঁছেও ফিরে আসতে বাধ্য হই,রাস্তা সারানোর কাজ চলছিল। তবে ফেরার পথে আদিবাসী গ্রামের কুঁড়েঘরের রংবেরঙের কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হতেই হয়। সন্ধে হয়ে আসছে। গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ দূরের পাহাড়ের দিকে চোখ আটকে গেল। চারিদিকে লাল আভা ছড়িয়ে পাহাড়ের কোলে সূর্যাস্ত - মন রাঙানো দৃশ্য। গাড়ি থামিয়ে কিছু মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দী করলাম। রিসর্টে যখন ফিরলাম - অন্ধকার নেমেছে - ঘড়িতে সাড়ে ছটা বাজে। পরেরদিন কোথায় যাব তা নিয়ে বিস্তর খোঁজাখুঁজি ও আলোচনার পর ঠিক হলো ঘাটশিলা ঘুরে আসা যেতে পারে। গুগুল ম্যাপে দেখলাম রিসর্ট থেকে ঘাটশিলার দূরত্ব প্রায় ৭৫ কিলোমিটার।

পরদিন ভোরবেলা প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে মনটা ভরে গেল - বেশ শীতল পরিবেশ, গাছে গাছে পাখিদের কলরব, রিসর্টের সদর দরজা দিয়ে বেরিয়েই সামনের পুকুরে জলে ওপারের গাছপালার প্রতিচ্ছবি। জাতীয় সড়ক ধরে এগোতে চোখে পড়ল অনতিদূরে ঠাকুরানী পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। একটু এগোতেই ডানহাতে হোটেল বাংরিপোসি - যেখানে বসে স্বনামধন্য লেখক বুদ্ধদেব গুহ লিখেছিলেন 'বাংরিপোসির দু'রাত্তির'।

রিসর্টের ম্যানেজারবাবুকে আমাদের ঘাটশিলা যাওয়ার ইচ্ছা জানাতে উনি বললেন যে জাতীয় সড়ক দিয়ে গেলে সময় বেশি লাগবে এবং রাস্তার অবস্থাও তথৈবচ। তার চেয়ে আদিবাসী গ্রাম, খানিক জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে শর্টকাট রাস্তা দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছব। রাস্তা হয়ত চওড়ায় ছোট, কিন্তু বেশিরভাগটাই মসৃণ। গুগুল-এ দেখলাম,ঠিকঠাক বুঝতে পারলামনা। বললাম, প্রধান জায়গার নামগুলো বলুন লিখে নিই, স্থানীয় লোকজনকে জিজ্ঞেস করে যাওয়া যাবে। বললেন, প্রথমে রিসর্ট থেকে জাতীয় সড়ক ধরে তিন-চার কিলোমিটার গিয়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরে যাবেন জোকা, তারপর সেখান থেকে অস্তি, তারপর ডুমুরিয়া ও অবশেষে মুসাবনি হয়ে ঘাটশিলা।

সকাল আটটায় রিসর্টে পুরি-সব্জি,চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। জাতীয় সড়ক থেকে বাঁদিকের রাস্তায় ঢুকলাম। মাঝে স্থানীয় কিছু লোককে জিজ্ঞেস করতে করতে চলেছি। দু-একবার বিপথে এগিয়েও গাড়ি ঘুরিয়ে আবার সঠিক পথ ধরলাম। একসময় হঠাৎ দেখলাম সামনে কাঁচা, ধুলোমাখা রাস্তা - গাড়ি হেলেদুলে চলছে। গাড়ির তলা মাঝে মাঝে লেগে যাচ্ছে হঠাৎ উঁচু হয়ে থাকা মাটির টিলাতে। গুগুলে দেখাচ্ছে 'unknown road'! একজনকে জিজ্ঞেস করাতে বললেন ঠিক রাস্তা দিয়েই যাচ্ছি,আরেকটু এগোলে ভালো রাস্তা পাবো। তাই-ই পেলাম। আধঘন্টা পর জোকা পৌঁছলাম। সেখান থেকে অস্তি যাওয়ার পালা। প্রায় একঘন্টার রাস্তা। মসৃণ, কখনো সোজা, কখনো আঁকাবাঁকা, কখনো চড়াই-উৎরাই রাস্তা ধরে গাড়ি ছুটছে হু-হু করে। ভেতরের রাস্তা বলে গাড়িঘোড়া নেই বললেই চলে। যেতে যেতে কিছু জায়গার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মুগ্ধ করে। কখনো রাস্তার দুধারে শালবন-লালমাটি, কখনো আদিবাসী গ্রামের সুন্দর সাজানো বাড়িঘর, কখনো ছোট ছোট বাজার।

অস্তি পৌঁছে একটা মোড় থেকে ডানদিকের রাস্তা চলে গেছে ডুমুরিয়ার দিকে। এবারে উড়িষ্যা পেরিয়ে ঝাড়খণ্ডে পড়লাম। প্রত্যেকটা জায়গার আলাদা একটা সৌন্দর্য আছে. মুসাবনি পৌঁছে প্রথম পেট্রল পাম্প পেলাম - পেট্রল ভরে নিলাম। তারপর আবার পথ চলা - এখানকার বাজার, রাস্তাঘাট বেশ জমজমাট। গুগুল-ও যেন স্বস্তি পেয়েছে ঠিকঠাক পথনির্দেশ দিতে পেরে। সুর্দা রোড ধরে এগোতেই একটা মোড়ে লেখা দেখলাম ডানদিকে ঘাটশিলা আর মাত্র ছয় কিলোমিটার। একটু পরেই চলে এল সুবর্ণরেখার ওপর ব্রিজ। পেরিয়েই ডান হাতে চোখে পড়ল হিন্দুস্তান কপার লিমিটেডের বিশাল কারখানা। সোজা এগিয়ে একটা মোড় থেকে আবার ডানদিকে। সামান্য এগোতেই ডানহাতে সার্কাসমাঠের পাশে ছোট রাস্তা। রাস্তাটা যেখানে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে দুভাগ হয়ে যাচ্ছে ঠিক সেখানে বাঁহাতে পড়বে 'গৌরীকুঞ্জ'।

গৌরীকুঞ্জ

বাংলার বিখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বাড়ি হল গৌরীকুঞ্জ। কর্মসূত্রে এসে সুবর্ণরেখার তীরের এই জায়গাটিকে ভালোবেসে ফেলেন। প্রায় কুড়ি বছর এই বাড়িতে থাকেন ও এখানেই মারা যান। বাড়িটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করে সংগ্রহশালায় পরিণত করা হয়েছে। সেখানে আছে ওঁর ব্যবহৃত পোশাকাদি,গ্রন্থসমূহ,হাতে লেখা 'পথের পাঁচালী'-র খসড়া ও নানাবিধ ছবি - একজন ভদ্রলোক সব বুঝিয়ে দিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনের পাশে ছোট মাঠের মতো জায়গা,তারপর 'অপুর পাঠশালা'-সেখানে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে।

বুরুডি হ্রদ

গুগুল ম্যাপে দেখলাম গৌরীকুঞ্জ থেকে বুরুডি হ্রদ যেতে প্রায় আধ ঘন্টা লাগবে। হাতে সময় কম - গাড়ি ছোটালাম সময় নষ্ট না করে। ঘাটশিলা টাউন পেরিয়ে,হাইওয়ে পেরিয়ে গাড়ি গিয়ে পড়ল সরু রাস্তায়,একসময় রাস্তার দুপাশে গাছ,ঘাসের জঙ্গল। গ্রামের মধ্যে দিয়ে সামনের রাস্তা ওপরের দিকে উঠে গেছে - সামনে পাহাড়। গাড়ি গিয়ে উঠল হ্রদের পাশের বাঁধ রাস্তায়। যদিও ভরদুপুরে এসেছি তবুও বুরুডি হ্রদের অপরূপ পরিবেশ মুগ্ধ করে। এখন হ্রদের জল কম কিন্তু পরিষ্কার,ওপারে চালচিত্রের মতো সাজানো পাহাড়ের সারি। সজোরে হাওয়া বইছে। রোদের তাপ যেন গায়ে লাগছেনা। বোটিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে। খানিক ঘুরে, চা খেয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম - ফিরতে হবে।

Burudi Lake, Ghatshila | Sandip Pal 2019

টানা ঘন্টাতিনেক ৯০ কিলোমিটার ড্রাইভ করে দুপুর তিনটে নাগাদ রিসর্টে ফিরলাম। গাড়ি থেকে নেমে ডান পা-টা আর ভাঁজ করতে পারছিলাম না পেশিতে এত লাগছে। যাইহোক, মধ্যাহ্নভোজন সেরে খানিক বিশ্রাম নেওয়া গেল। বিকেলে বুড়িবালামের তীরে ঘুরে এলাম। খুব সুন্দর জায়গা। পরেরদিন সকাল আটটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম - ঘরে ফেরার পালা।

পরিশিষ্ট: তিনদিন দুরাতে চারজনের খাবার খরচ পড়েছিল ১৮৪১ টাকা। মানে জনপ্রতি ২৩০ টাকা প্রতিদিন। যারা ট্রেনে যেতে চান: ধৌলি এক্সপ্রেস (১২৮২১) হাওড়া থেকে সকাল ৬টা - বালাসোরে পৌঁছনোর সময় সকাল ৯:৩৫, বালাসোর থেকে ডেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন (৭৮০১৩) সকাল ১০:০৫ - বাংরিপোসি স্টেশন পৌঁছনোর সময় দুপুর ১২:৩০। স্টেশন থেকে অটো পাওয়া যাবে।

পেশায় ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সন্দীপ পাল সোসাইটি ফর রেডিয়েশন রিসার্চ ও ইন্ডিয়ান বায়োফিজিক্যাল সোসাইটির সদস্য। জীববিদ্যার সাথে যুক্ত থাকার কারণেই হয়তো প্রকৃতির প্রতি অমোঘ টানে ঘুরে বেড়ান দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গায়। একসময় ছবি আঁকতেন, আর এখন ছবি তোলাটা প্রায় নেশার পর্যায়ে পৌঁছেছে। হালে লেখালেখির চর্চাটা বেড়েছে মূলত তাঁদের জন্যে যাঁরা ওঁর লেখা মন দিয়ে পড়েন ও উৎসাহ দেন প্রতিনিয়ত।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Sign Up to see what your friends like.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

গোয়ায় বারবার

সুচন্দ্রিমা চৌধুরী

~ গোয়ার আরও ছবি ~

যখন তৃতীয়বার গোয়া যাওয়ার প্রস্তাব তুললাম, বাড়ির সকলে এককথায় প্ল্যানটা নাকচ করে দিল। প্রথম দুবার গোয়া গেছিলাম অনেক আগে। তখন নর্থ গোয়াতেই ছিলাম। একদিনের ট্যুরে সাউথ গোয়া ঘুরে এসেছিলাম। প্রতিবারই ভাল লেগেছিল। এবার বেশ অনেকটা সেই পাহাড় টানার মত সমুদ্র মন টানছিল। কলকাতা থেকে কাছেপিঠে সমুদ্রে যাবার অনেক অপশন। আমি দিল্লি থেকে যাব। মন চাইছিল একটা ছোট শহর হবে সমুদ্রের ধারে। নিরিবিলি আর নিজস্বতাসমৃদ্ধ এক সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ থাকবে। সমুদ্রের ধারে ছিমছাম থাকার জায়গা হবে - যেখানে বসে ক'টাদিন সমুদ্রের ঢেউ গুনে কাটিয়ে দেব। শেষ যেবার গেছিলাম তখনই ঠিক করে ফেলেছিলাম যে এরপর এলে সাউথ গোয়াতে থাকব। বাড়ির সকলে নাকচ করলে হবে কী – আমি তো ছবিতে দেখেছি ও পড়েছি সাউথ গোয়ার বিচ সম্বন্ধে। নর্থ গোয়ার সঙ্গে অনেক ফারাক। এবার শুধু বাড়ির লোকজনকে বোঝানো। করলাম কী, থাকার জায়গা আর তার চারপাশের ছবি দেখাতে থাকলাম, জায়গার নাম না বলে। তাতেই কাজ হল - সমুদ্র, আশপাশ আর হোটেল দেখে বাড়ির লোকজন দু পায়ে রাজি। তারপর আর কী? জায়গার নামটা বলতেও এবার আর কোন বাধা এল না। এবার তিনদিন শুধু সমুদ্রে আর আশপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশে ডুব দিয়ে কাটিয়ে দেব - এই ঠিক হল।

এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি ছুটল। সাউথ গোয়ার দিকে মোড় ঘুরে পাহাড়ি রাস্তায় বাঁক নিতেই যেদিকে দুচোখ যায় কাজুর গাছ। তার ওপারে নীল সমুদ্র। এই বিশাল কাজুর বাগান পেরিয়ে সাউথ গোয়ায় প্রবেশ করতেই সুন্দর ছোট ছোট গ্রামের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। বর্ধিষ্ণু সব গ্রাম। নারকেল গাছের ছায়ায় ছবির মত সব বাড়ি। এদিকে এক অদ্ভুত ধরনের নারকেল দেখলাম -হলুদ রঙের। এয়ারপোর্ট থেকে আড়াই ঘণ্টার রাস্তা কোলভা। জমজমাট জায়গা। মাছুয়ারাদের পট্টির পাশেই আমাদের রিসর্ট। ঘরের বিশাল কাঁচের জানলা দিয়ে দেখা যায় দিগন্তবিস্তৃত আরবসাগর।

কোলভা বিচে সূর্যাস্ত

যখন পৌঁছলাম,তখন সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েছে। সমুদ্রের জলে তখন নানা রঙের খেলা। ঘরের বাইরেই লন আর লন পেরলেই বিচের বালি শুরু। এদিকটায় ফরেনারদের আনাগোনাই বেশি। আর দক্ষিণ ভারতীয়রাও আসে অনেক। ফরেনারদের মধ্যে রাশিয়ানরা আসে প্রচুর। একসময় বহুদিন ধরে একমাত্র রাশিয়া থেকেই সরাসরি বিমান নামত গোয়ায়। আর এইজন্য প্রচুর রাশিয়ানদের আসাযাওয়া শুরু থেকেই। এমনকী এই সাউথ গোয়ায় অনেক দোকানে রাশিয়ান লেখা দেখতে পাবেন ও রাশিয়ান খাবারও পাবেন। এখানকার ছোট দোকানদাররা রাশিয়ান বলতেও পারে। শুরু থেকেই এই রৌদ্রস্নাত ঝলমলে বিচ, সুন্দর আবহাওয়া আর সস্তায় থাকা ওদের আকর্ষণ করেছে।

যাক বলছিলাম হোটেলের কথা। লন পেরলেই বালি শুরু। কোলভায় মাছুয়ারাদের বিরাট পট্টি। ছাউনিকরা মাছুয়াপট্টি ছাড়াও বর্ধিষ্ণু সচ্ছল মাছুয়ারাদের বাড়িও সমুদ্রের পাড় ধরে। যাদের পাকাবাড়ি তাদের নিজস্ব নৌকা। পরদিন ভোরেই সমুদ্রের ধার ধরে হাঁটতে হাঁটতে এইসব নৌকাদের পাড়ে ভেড়ানোর দৃশ্য দেখছিলাম। কী কঠোর পরিশ্রম করে নৌকাগুলোকে পাড়ে তুলছিল একসঙ্গে দশ থেকে বারোজন মিলে।

জীবনযাত্রাই এদের সবাইকে একত্র করে রেখেছে। ওদের নৌকা পাড়ে লাগতেই শুরু হয়ে গেল মাছের বেচাকেনা। কত মাছ চলে গেল প্যাকিং বাক্সে – প্যাক হয়ে চলে যাবে দূরদূরান্তে। কিছু চলে গেল রোদে শুকাতে। বাকি মাছ নিয়ে বসে গেল বাজার। এই সকালের মাছের বাজারে মাছ না কিনলেও মাছের গন্ধ সহ্য করতে পারলে এ বাজারে ঢুঁ মারা এক অনন্য অভিজ্ঞতা। জীবনের এক সুন্দর ছবি দেখতে পাওয়া যায়। গোয়া থাকাকালীন এক দিনও এই বাজার মিস করিনি। অনেক বিদেশীকে দেখেছি এখান থেকে মাছ নিয়ে যেতে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি এই বিচগুলির ধারে অনেক বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় থাকার জন্য। এই বাড়িগুলিতে কেয়ারটেকার, রান্না করা খাবার ও সবরকম সুব্যবস্থা আছে। বাড়িগুলোর পরিবেশও ভারি মনোরম। চাইলে নিজেরা রান্না করেও খাওয়া যায়। অথবা বাজার করে কেয়ারটেকারের হাতে তুলে দিলে, তারাও খাবার বানিয়ে দেয়। বিদেশীদের বিরাট দলটি যাদের রোজ মাছ কিনতে দেখতাম,এমনই এক বাড়ি ভাড়া করে ছিল। প্রতিদিন ওরা টাটকা মাছ নিয়ে যেত। এই সদ্য ধরা মাছের কিছু আবার চলে যেত বিচের শ্যাকের দোকানিদের কাছেও। বিচের উপর সার দিয়ে কাঠের মাচা বাঁধা – খাওয়ার ও বসার জায়গা। নানান রকমারি সব নাম তাদের। এদেরই শ্যাক বলে। এখানে নানান টাটকা খাবার পাওয়া যায় আর পাওয়া যায় ঘণ্টা হিসেবে বসার জায়গা - সমুদ্রকে কাছ থেকে অনুভব করার জন্য। এখানে বলে রাখা ভাল - নর্থ গোয়ার বিচ ও শ্যাকের অভিজ্ঞতা থেকে এখানের অভিজ্ঞতা তুলনা করে লাভ নেই। এখানে বিচ অনেক নিরিবিলি। শ্যাকগুলিও অনেক ছিমছাম ও সুন্দর। একদিনের বেশি থাকলে, একই শ্যাকে একের বেশি বার গেলে ওরা খাতির করে আর ঘণ্টাপিছু চার্জ করে না। রাতের অন্ধকারে যখন এই শ্যাকগুলো মোমবাতির আলোতে সেজে ওঠে, কালো অন্ধকার চিরে সমুদ্রের গর্জন আছড়ে পড়ে তখন বড়ই মোহময় হয়ে ওঠে পরিবেশ।

ভোরবেলা মাছের বাজারের বেচাকেনা সাঙ্গ হলে রোজ হাঁটতে বেরোতাম সমুদ্রের পাড় বরাবর। কোলভা বিচ বিশাল লম্বা। ডান দিকে ঘণ্টাখানেক হাঁটলে পৌঁছে যাওয়া যায় বেতাল বেতিম বিচে। আর বাম দিকে ঘণ্টা খানেক হাঁটলে পৌঁছে যাওয়া যায় বেনৌলিম বিচে। এই হাঁটাহাঁটি আর সমুদ্রস্নান চলল তিনদিন ধরে। তার সঙ্গে সমুদ্রপারের শ্যাকগুলোতে ইচ্ছেমত খাওয়া দাওয়া। এখানের সমুদ্রে স্নান করার কোন বাধা নেই। অনেক লাইফ গার্ডের পোস্ট আছে। তারা সবসময় নজরদারি করে। আমরা কালীপুজোর সময় গিয়েছিলাম বলে সমুদ্রে ঢেউ পেয়েছি বেশ ভালই। আর আবহাওয়াও ছিল খুব ভাল। মে-

জুনের গরমটা বাদ দিলে বাকি সব সময়ই আবহাওয়া ভালই থাকে। এরই মধ্যে একদিন দুপুরে ঘুরে এলাম নর্থ গোয়া যার মধ্যে পাঞ্জিমও পরে। পাঞ্জিম শহরটা দারুণ সুন্দর। মেন বাজারটাতে পুরনো আর নতুনের সমন্বয় চোখ কাড়ার মত। পাঞ্জিম শহর ও আশেপাশে পর্তুগিজ আমলের পুরনো সব চার্চ ঘুরে দেখতে একদিন লাগল। একদিন ঘুরে এলাম দুধসাগর জলপ্রপাত। একদিন সাউথ গোয়া ট্যুরে গেলাম - নানান মন্দির ও প্রত্যন্ত গ্রাম ঘুরতে।

গোয়ার সমুদ্রের একটা অদ্ভুত মাদকতা আছে। তবে এই সমুদ্রের সাথে প্রেম জমাতে গেলে যেতেই হবে সাউথ গোয়াতে। পুরনো গোয়াকে নতুন করে পেতে যতবার ছুটে যাবেন গোয়া আপনাকে নিরাশ করবে না। সাউথ গোয়ার বিচগুলো অনেক পরিষ্কার। এখানে ভিড় নেই। পালোলেম,বেতাল বেতিম,বেনৌলিম, মরজিম, আগণ্ডা আর কোলভা হল কয়েকটি নাম করা বিচ যেখানে খুব ভাল থেকে শুরু করে মাঝারি মানের সব রকমের হোটেল পাবেন। এগুলির মধ্যে যেকোনো জায়গায় সমুদ্রের ধারে আপনার পছন্দমত জায়গা বুক করতে পারেন। যদি বড় গ্রুপ নিয়ে যান তবে বাড়ি ভাড়া নিতে পারেন - অন্য রকম করে উপভোগ করতে পারবেন।

ডোনা পাওলা বিচে শান্ত ব্যাকওয়াটার

সাউথ গোয়ার আসল আকর্ষণ হল এখানে কম লোকজনের আনাগোনার কারণে প্রকৃতিকে মনের মত করে খুঁজে পাওয়া যায়। ঘন সবুজ প্রকৃতি আর পরিষ্কার সোনালি, নিরিবিলি সমুদ্র সৈকত এখানের প্রধান আকর্ষণ। পালোলেম এদের মধ্যে মন কাড়বে সবচেয়ে বেশি। যদি পাহাড় আর সমুদ্রকে একসঙ্গে পেতে চান তবে পালোলেম বিচে যেতে পারেন। আর যদি

নিরিবিলির মধ্যেও গোয়ার নিজস্ব কালচার আর মানুষগুলোর জীবন আরও কাছ থেকে দেখতে চান- তবে যেতে হবে কোলভা বা বেতাল বেতিমে। যদি বড়দিন বা নিউইয়ারের সময় যান এক অন্য গোয়াকে দেখতে পাবেন। এসব সময় এখানে কার্নিভাল হয়। উৎসবের রঙে সেজে ওঠে গোয়ার শহর।

সাউথ গোয়ার সব বিচেই স্নান করা যায়। আর নিরিবিলি হওয়াতে এখানে স্নান করার অভিজ্ঞতাও অন্যরকম হবে। বিচগুলোতে নানান জলক্রীড়ারও ব্যাবস্থা আছে। বিচ থেকে রাস্তায় উঠলে দুধারে দোকানিদের পশরা। নানা খাবার, কাজুর ও ট্যাটু বানানোর দোকানগুলো নানা রঙে ও আমেজে সেজে ওঠে সন্ধ্যার অন্ধকার জাঁকিয়ে বসতেই। বিচের লাগোয়া ছোট ছোট শহরগুলো পুরো জমজমাট হয়ে ওঠে সন্ধ্যের বেচাকেনায়। এখানে নানান স্থানীয় খাবার দোকান। তাতে গোয়ানিজ থেকে চাইনিজ সবধরনের খাবার পাওয়া যায়। একবার মালাবার চিংড়ির কারি চেখে দেখতে পারেন। আর তাছাড়া রাতেও যদি সমুদ্রকে ছাড়তে মন না চায়, সমুদ্রের বিচেও সুন্দর পরিষ্কার শ্যাকে রাতের খাবার পাবেন। তাতে পাবেন নানান দেশ বিদেশের খাবার থেকে শুরু করে গোয়ার নিজস্ব খাবারও। সাউথ গোয়ার বিচগুলিতে ফরেনারদের আধিক্যই বেশি। যদি নর্থ গোয়ায় আগে গিয়ে থেকেও থাকেন, সাউথ গোয়া গেলে তাকে অন্য রূপে পাবেন। গোয়া যাবার আদর্শ সময় নভেম্বর থেকে মার্চ। কেউ কেউ আবার গোয়ায় বর্ষার রূপ দেখতেও যান। সেও এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ
১। সাউথ গোয়া থেকে নর্থ গোয়া ঘুরে আসা যায়। নর্থ গোয়া যেদিন যাবেন, সেদিনই চার্চ ও মঙ্গেশকার মন্দির ঘুরে আসা যায়। পানাজির বাজার দেখতে ভুলবেন না। পুরাতন আর আধুনিকের এমন মেলবন্ধন খুব কম জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়।
২। স্পাইস গার্ডেন ট্যুরে না যাওয়াই ভাল। বরং সময় পেলে দুধসাগর জলপ্রপাত ঘুরে আসা যায়।
৩। যেকোনো বিচের ধারে মার্কেটে সাইকেল, বাইক ও গাড়ি সবই ঘন্টা হিসেবে ভাড়া পাওয়া যায়।
৪। সাউথ গোয়াতে আগে থেকে থাকার জায়গা বুকিং করে যাওয়াই শ্রেয়।

~ গোয়ার আরও ছবি ~

সুচন্দ্রিমা চৌধুরী একজন শিক্ষাবিদ। শিক্ষামূলক ও পাঠ্যপুস্তক লেখা বাদে ঘোরা তাঁর নেশা। তাঁর মনে হয় সেইসব দেশবিদেশে ঘোরার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার মধ্যে যে আনন্দ তা ঘোরার থেকে কিছু কম নয়। প্রতিটি চেনা-অচেনা জায়গারই এক অনন্যতা আছে। তা দেখার জন্য চাই চোখ ও মন। এরকমই চেনা অচেনা, জানা অজানা জায়গার অভিজ্ঞতা তাঁর ভাগ করে নেওয়ার ইচ্ছা 'আমাদের ছুটি'র পাঠকদের সঙ্গে।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Sign Up to see what your friends like.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

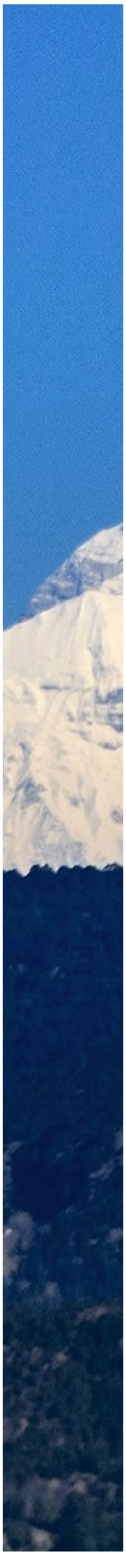

চমৎকার চৌকরি

অরিন্দম পাত্র

~ কুমায়ুনের আরও ছবি ~

বিনসর ইকো ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়লাম সকাল সকাল,আজকের গন্তব্য চৌকরি ভায়া পাতাল ভুবনেশ্বর।

সুদীর্ঘ পথ। মাঝেমধ্যে পথের ক্লান্তি ভুলিয়ে দিচ্ছে এক একটা বাঁক -শ্বেতশুভ্র শৃঙ্গরাজি উঁকি মেরে যাচ্ছে। আর আমাদের শিরায় শিরায় শক্তি সঞ্চার করে যাচ্ছে।

তবে দীর্ঘ কুমায়ুন ভ্রমণে প্রতিদিনের ক্লান্তিকর জার্নি আজ অল্প হলেও থাবা বসাচ্ছে আমাদের শরীরে। গাড়ি থামিয়ে মাঝে মাঝে মিসেসকে আর ছেলেকে চোখেমুখে জল দিয়ে আর ওষুধ খাইয়ে পরিচর্যা করতে হচ্ছে। আমি এখনও অবধি ঠিক আছি। ঈশ্বরেরআশীর্বাদে পাহাড়ি পথে এখনো অবধি অতটা অসুস্থ হই নি।

যাই হোক,এইভাবে চলতে চলতে এসে পড়লাম পাতাল ভুবনেশ্বর। প্রবেশপথের বাইরে দোকান থেকে পুজোর উপাচার কিনে নিয়ে চললাম। আশেপাশে বেশ কিছু লজ,হোম স্টে-র দেখা মিলল। কুমায়ুনের যাত্রাপথে পাতাল ভুবনেশ্বর একটি অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান। পুরাণ মতে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর বাস এই গুহাগর্ভে। কথিত আছে আদি শঙ্করাচার্য প্রথম এই গুহামন্দিরে পূজাপাঠ চালু করেন।

পুজোর ডালি নিয়ে এগিয়ে চললাম পায়ে পায়ে। আগেই ঠিক করে নিয়েছিলাম গুহাগর্ভে প্রবেশ করব না। ছেলে আর মিসেসের শরীর ভাল ছিল না আর ওদের একা রেখে নীচে নামা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। গুহামন্দিরের প্রবেশপথ দেখলেও বুক শুকিয়ে যায়। খুব সঙ্কীর্ণ এবং মাথা নীচু করে হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করতে হয়।

যাই হোক,বাইরের ছোট্ট মন্দিরে পূজারীজির কাছে পুজো দিয়ে আমরা ফিরে চললাম। পূজারীজি হাল্কা তিরস্কার করলেন,"আরে দাদা! কুছ হবে না। নীচে যান না!" প্রচুর বাঙ্গালী পর্যটকের সংস্পর্শে এসে ওঁর বাংলাটা কিন্তু জবরদস্ত হয়ে উঠেছে! হাসিমুখে আমাদের অক্ষমতার কথা জানিয়ে চলে এলাম।

আবার গাড়ি ছুটল,চৌকরি আরও প্রায় ৩৯ কিমি দূরে। কে এম ভি এন-এর গেস্টহাউস এখানকার থাকার জায়গাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তবে এযাত্রা আমাদের ঠাঁই হতে চলেছে হোটেল ওজস্বীতে। দেখতে দেখতে চলে এলাম হোটেলে। সুন্দর ছিমছাম হোটেল। দীর্ঘযাত্রা শেষ হতে সবাই বেশ খুশি হয়ে উঠেছিলাম। ছেলে আর মিসেসও অল্পবিস্তর সুস্থ হয়ে উঠেছিল। খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছিল সবার। ছেলের ইচ্ছে হল চাইনিজ খাওয়ার। সেইমত হোটেলের রুমে লাঞ্চ আনিয়ে খেয়ে নেওয়া হল। আমার ঘুম আসছিল না। সামনে বিরাট বাগান আর একটা প্রশস্ত বারান্দা মত সাজানো জায়গা - ভিউপয়েন্ট গোছের। ওইখানে দাঁড়িয়ে চারিদিকের দৃশ্যসুখ উপভোগ করছিলাম। চৌকরিকে বলা হয় কুমায়ুনের মাউন্টেন গ্যালারি। কিন্তু আজ আকাশ সাদা পেঁজা তুলোর মত কুণ্ডলীপাকানো মেঘে ঢাকা। হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গমালা আজ অদৃশ্য।

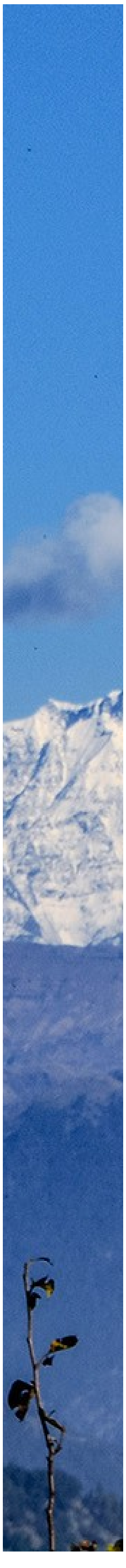

হঠাৎ পেছনে বিকট আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকিয়ে দেখি,পর পর বেশ কয়েকটি রুমের বাইরে রাখা বাসনকোসন নিয়ে কাড়াকাড়ি খেলায় মেতেছে এক পাল বানর। পাশেই ঘন জঙ্গল আর গাছপালার সমারোহ। ওনাদের আবির্ভাব ওখান থেকেই ঘটেছে বোধকরি। এমতাবস্থায় আর বাইরে থাকা উচিত না বুঝে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়লাম। তখনও ওনারা আমাদের ঘরের সামনে নেমন্তন্ন খেতে হাজির হন নি!

আস্তে আস্তে বেলা পড়ে আসছে। বাইরে মুখ বাড়িয়ে আর তেনাদের দেখা পেলাম না। ছেলে আর ছেলের মা ঘুমে অচেতন। ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে দরজা টেনে লক করে বেরিয়ে পড়লাম। হোটেল রিসেপশনে জিজ্ঞেস করে জানলাম বাইরে বেরিয়ে ডানদিকে অল্প হাঁটলেই সানসেট পয়েন্ট পাওয়া যাবে। আর বাঁ দিকে গেলে পরমহংস আশ্রম।

ঠিক করলাম আশ্রমে কাল সকালে যাব। আপাতত সানসেট পয়েন্টে যাই। বাইরে বেরিয়ে রাজকুমারের সঙ্গে দেখা -আমাদের সারথি। সব শুনে উনিও আমার সঙ্গী হলেন। দুজনে গল্প করতে চললাম অচেনা পথ ধরে। মিনিট আষ্টেক হেঁটে এলাম সানসেট পয়েন্টে। সূর্য তখন প্রায় ডুবু ডুবু! আমার ছবি তোলার নেশার ব্যাপারে এতদিনে রাজকুমার ওয়াকিবহাল। উনি আমাকে বেশ ক'টা ভাল জায়গা দেখিয়ে সেখান থেকে ছবি তুলতে বললেন। পশ্চিম আকাশে রাঙা কমলালেবুর মত সূর্য অস্ত গেল। রাজকুমার আর আমি হোটেলে ফিরে চললাম।

বিনসরের রাতটা ছিল কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার রাত। গোল থালার মত পূর্ণচন্দ্র উঠেছিল আকাশে। চৌকরির আকাশেও দেখা পেলাম সেই একইরকম চাঁদের! সেই শোভা দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লাম কখন।

পরের দিন ভোরবেলা চৌকরি আমাদের নিরাশ করেনি। চৌকরির মাউন্টেন গ্যালারি নাম মাহাত্ম্যের প্রমাণ পেয়েছিলাম পরের দিন ভোরেই। ঘুম ভাঙল বেশ ভোরে। সাড়ে পাঁচটা বাজে। জানলার পর্দা সরিয়ে উঁকি মারলাম। অল্প অল্প আলো ফুটবে ফুটবে করছে। গায়ে একটা সোয়েটার চাপিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। সামনের সেই ভিউ পয়েন্টের কমন বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। পুব আকাশ আস্তে আস্তে রাঙা হয়ে উঠছে। লালচে আভা পুব দিগন্ত জুড়ে। প্রচুর পাখির কলতানে তখন কান পাতা দায়। চৌকরিতে ভোর জেগে উঠছে।

তখনও কি জানতাম দিনের আলো ফুটলে কী অপরূপ দৃশ্য দেখতে পাব! সেই অনুপম ভোরের ছবি ক্যামেরাবন্দী করতে তখন আমি ব্যস্ত। লালচে থেকে কমলা তারপর আস্তে আস্তে সোনালী রোদ নেমে এল। অস্পষ্ট আলোর আভায় দেখা যাচ্ছিল কাছের পাহাড়গুলোর স্তরের পর স্তর (mountain layers)। রোদ ওঠার পর দূরদিগন্ত জুড়ে দৃশ্যমান হয়ে উঠল হিমালয়ান রেঞ্জ! সে এক অপরূপ দৃশ্য! আকাশে গতকালের মত মেঘের চিহ্নমাত্র আজ আর নেই। চৌকরি আজ সত্যিই মাউন্টেন গ্যালারি -সার্থকনামা হয়ে উঠেছে!

এ দৃশ্য তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিলাম। হঠাৎ কানে ভেসে এল দূর থেকে সুগম্ভীর প্রার্থনা সঙ্গীত। পরমহংস আশ্রম থেকে ভেসে আসা জলদগম্ভীর সেই প্রার্থনাগীতি! মুহূর্তে যেন পরিবেশ হয়ে উঠল ঐশ্বরিক। অনন্যসুন্দর এবং আধ্যাত্মিক যেন সে এক অনুভূতি!!

তবু ঘরে ফিরে আসতে হল তাড়াতাড়ি। সকাল সাড়ে নটার মধ্যে চেক আউট করতেই হবে। অনেকটা পথ যেতে হবে আজ মুন্সিয়ারির উদ্দেশ্যে - প্রায় ৯০-১০০ কিমি।

রেডি হয়ে ঘর ছেড়ে দিয়ে লাগেজ রিসেপশনে রেখে একবার এগিয়ে চললাম পায়ে পায়ে পরমহংস আশ্রমের দিকে। হোটেল থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে একটা পায়ে চলা রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ এগোলেই আশ্রম পড়ে। প্রার্থনাগীতি আপাতত বন্ধ এখন। আশ্রমের কাছে এসে স্থানুবৎ হয়ে গেলাম। যে হিমালয়ান রেঞ্জ ঘরের বারান্দা থেকে ক্যামেরার জুম বাড়িয়ে দেখছিলাম,আশ্রমের একটু পিছনের অংশ থেকে সেই তাদেরই যেন হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারব! মনের আনন্দে আমি তখন শুধু ছবি তুলতে ব্যস্ত। আশ্রমে যাওয়ার কথা ভুলেই গেছি।

চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল, গাছের আড়ালে দূরের ছোট্ট দোতলা বাড়িটা। হঠাৎ চটক ভাঙ্গল ঢং ঢং করে ঘন্টার আওয়াজে। কোথা থেকে আওয়াজ আসছে দেখতে গিয়ে দেখি... ওকি! ওটা একটা স্কুল না? সত্যিই তো। এতক্ষণে দূর থেকে কচিকাঁচাদের শোরগোলের আওয়াজও শুনতে পেলাম। সকালে স্কুল বসেছে, ছোট্ট বিদ্যার্থীরা স্কুলে আসছে এক এক করে। এই উদাত্ত, নৈসর্গিক পরিবেশের মাঝে স্কুলটিকে দেখে সুনির্মল বসু মহাশয়ের কবিতাখানা মনে পড়ে গেল!

"আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাই রে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাই রে।
পাহাড় শিখায় তাহার সমান -
হই যেন ভাই মৌন-মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে -
দিল-খোলা হই তাই রে।"

উদার প্রকৃতির মাঝে এই বিদ্যালয়ে পাঠরত বাচ্চারা যে সুন্দর শিক্ষা পাবে,তা কি আর আমাদের ইট-কাঠ-পাথরের যান্ত্রিক সভ্যতার স্কুলে দেওয়া সম্ভব? বাচ্চাগুলির কাছে ছুটে চলে যেতে ইচ্ছা করছিল কিন্তু আমাদের গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। তাই হিমালয়কে প্রণাম জানিয়ে বাচ্চাগুলির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনা করে এগিয়ে চললাম। গন্তব্য মুন্সিয়ারি..

একলব্য একাডেমি

~ কুমায়ুনের আরও ছবি ~

পেশায় চিকিৎসক (নাক কান ও গলা বিশেষজ্ঞ) অরিন্দম পাত্র-এর নেশা ছবি তোলা। এছাড়াও দেশের মধ্যে নানা জায়গায় ভ্রমণ করা তাঁর আর এক শখ।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Sign Up to see what your friends like.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

গোঁসাইকুণ্ড ট্রেক

পল্লব চক্রবর্তী

~ ল্যাংটাং-গোঁসাইকুণ্ড ট্রেকরুট ম্যাপ ~ গোঁসাইকুণ্ড ট্রেকের আরও ছবি ~

-এবার আমরা কিন্তু বিদেশে গিয়ে ট্রেক করব।
অর্জুনের কথাশুনে আন্দাজ করতে পারি এটা কোথায় হতে চলেছে, তবু মজা করে বলি,- কোথায় রে? সুইস আল্পস, নাকি আন্দিজের কোথাও? আমার কিন্তু পাসপোর্টও নেই, পয়সাও নেই। অর্জুন গম্ভীর গলায় জানায় – ওসব কিসসু লাগবেনা, তুই নেপালের গোঁসাইকুণ্ডের নাম শুনেছিস তো? এবার যাওয়া হচ্ছে ওখানে, তুই ইমিডিয়েট তরুণদাকে ফোন কর।

ল্যাংটাং ভ্যালি আর গোঁসাইকুণ্ড ট্রেকের কথা আগেই পড়েছি। নেপালের জনপ্রিয় ট্রেক রুটগুলোর মধ্যে অন্যতম। স্বয়ং উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গিয়েছিলেন গোঁসাইকুণ্ড। কিন্তু দু'দিনে ধুনচে থেকে ৪৩৮০ মিটার উচ্চতায় গোঁসাইকুণ্ডে পৌঁছে ৪৬১০ মিটার উঁচু পাস পেরিয়ে সুন্দরজাল হয়ে কাঠমাণ্ডু পৌঁছানো আমার মতো সখের ট্রেকারের পক্ষে বেশ কঠিন কাজ। তবু পাহাড়ের জন্য মন কেমন করে ওঠে, ফোন লাগাই কলকাতার ট্রেকার্স মহলে পরিচিত নাম তরুণদাকে। বাষট্টি বছরের টগবগে তরুণদা আশ্বাস দেন, -যদি পাহাড়কে ভালোবাসো আর মনে জোর থাকে তবে এ ট্রেক মোটেও কঠিন নয়। মিনমিন করে বলি, -যেতে তো ইচ্ছা করছে, কিন্তু পেরে উঠব তো? তরুণদা শেষটুকু আর শোনেন না, বলেন, – ঠিক আছে, তোমার টিকিট কেটে ফেলছি। তরুণদার বাড়িতে টিম মিটিং-এ দেখা হয় পুরো দলের সঙ্গে, অর্জুন আর স্নিগ্ধাদি ছাড়া সবাই আমার অপরিচিত। তবু বয়সের ভেদরেখা পেরিয়ে বন্ধু হয়ে যাই সবাই।

শেষপর্যন্ত পাহাড়ের টানে বেড়িয়ে পড়ি। পিছনে পড়ে থাকে ছকেবাঁধা জীবনের রোজনামচা। একে বাইরের দেশ তার ওপর সব মিলিয়ে এগারো দিন, বেজায় ভারি হয়ে পড়ে স্যাক। ৭ অক্টোবর দুগগা দুগগা বলে আমরা দশ জন চেপে বসি মিথিলা এক্সপ্রেসে। সকালে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লেট করে রক্সৌল পৌঁছানোর পরই তরুণদা ঝটপট টাঙ্গা ঠিক করে ফেলেন নেপালের বীরগঞ্জ যাওয়ার জন্য। এটাই নাকি নেপাল প্রবেশের একমাত্র বাহন। ভাঙাচোরা ধূলিধূসরিত রাস্তা আর যানজট পেরিয়ে নদীর ওপর ব্রিজ অতিক্রম করে বিদায় জানাই আমার মাতৃভূমিকে। হাতঘড়ির কাঁটাকে নেপালের সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে দিই পনেরো মিনিট।

বীরগঞ্জ পৌঁছে তাড়াতাড়ি কাঠমাণ্ডু যাওয়ার গাড়ি ঠিক করে হাতমুখ ধুয়ে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ সেরে ফেলি। ছেড়ে দেয় গাড়ি। পারসা ন্যাশনাল পার্কের ঘন সবুজের বুক চিরে চলে যাওয়া রাস্তা ধরে যেতে বেশ ভালই লাগছিল। আরও কিছুটা যাওয়ার পর শুরু হল পাহাড়ি রাস্তা। তবে শেষের দিকটা রাস্তার বদলে কেবল বোল্ডার আর ধুলো। এদিকে সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হয়ে এসছে। ক্লান্তি আর বিরক্তি নিয়ে সবাই চুপচাপ বসে আছি। এমন সময় ওপর থেকে দেখা গেল কাঠমাণ্ডু শহরের আলো – চারপাশের পাহাড়ঘেরা এক উপত্যকায় মিট মিট করে জ্বলছে হাজার জোনাকি, অসাধারণ সেই ছবি। এর প্রায় আরও দু'ঘণ্টা পরে গাড়ি এসে থামল থামেল বাজারে এক হোটেলের সামনে।
কাঠমাণ্ডুতে হাসি মুখে স্বাগত জানালেন আমাদের এই ট্রেকিং ক্লাবের আর এক সিনিয়র সদস্য এবং কর্মসূত্রে গত পাঁচ বছর ধরে এই শহরের বাসিন্দা সুকান্তদা। বলতে গেলে আমাদের এই সফরের সব ব্যবস্থাপনা তাঁরই। সুকান্তদা আলাপ করিয়ে দিলেন তার পাশে দাঁড়ানো এক নেপালি যুবকের সঙ্গে - সুবর্ণ শ্রেষ্ঠা, এক এনজিও তে চাকরিসুত্রে ল্যাংটাং ভ্যালি আর গোঁসাইকুণ্ড অঞ্চলে মাঝে মাঝে যেতে হয় তাঁকে। এই সুবর্ণ দাজুই হবেন আমাদের আগামী কয়েক দিনের গাইড। হোটেলে ঢুকে আগে ভালো করে স্নান করি, সারাদিনের রাস্তার ধুলোময়লা আর ক্লান্তি ধুয়ে ফেলে অনেক হালকা লাগে নিজেকে। আগামীকাল আমাদের কাঠমাণ্ডুতে বিশ্রাম আর টুকটাক ঘুরে দেখা। নেপালকে কিন্তু একদমই বিদেশ বলে মনে হয় না আমাদের। স্থানীয়রা সবাই যথেষ্ট ভালো হিন্দি বলেন আর ভারতীয় মুদ্রা চলে সর্বত্র, আমাদের মুদ্রায় একশো টাকা নেপালি মুদ্রায় একশো ষাট টাকার সমান। রাস্তায় চোখে পড়ে প্রচুর ট্রেকিং আর মাউন্টেনিয়ারিং সরঞ্জামের দোকান। সবাই ঠিক করি কাল ট্রেকিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় টুকটাক জিনিস কিনব।

পরদিন সকালে উঠে স্নান করে বেরিয়ে পড়ি পশুপতিনাথজীর মন্দিরের উদ্দেশ্যে। পাণ্ডার উৎপাতবিহীন এই মন্দিরে

পশুপতিনাথ দর্শন করে মনটা বেশ খুশি খুশি লাগে। পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখি দরবার স্কোয়ার আর আশেপাশের যা কিছু দ্রষ্টব্য। বারে বারে মনে পড়ে যায় ফেলুদা, তোপসে আর লালমোহনবাবুর কথা, সেই ছোটবেলায় কাঠমাণ্ডুর সঙ্গে পরিচয় তো তাঁদের হাতধরেই। শহর ঘুরে মন ভরে না, সবটাই প্রায় বাকি থেকে যায়। দেখা হয় না পাটন কিংবা ভক্তপুর। নিজেকে বোঝাই, আমরা তো নিছক ট্যুরিস্ট নই, আমরা ট্রেকার! ফেরার পথে যদি সময় পাই, তখন না হয় দেখা যাবে।

পরদিন ঠিক সাড়ে ছটায় কুয়াশামাখা এক অস্পষ্ট ভোরে আমাদের মাইক্রোবাস কাঠমাণ্ডু ছাড়ল – গন্তব্য ধুনচে, রসুয়া জেলার সদর শহর, কাঠমাণ্ডু থেকে দূরত্ব মোটামুটি ১৩০ কিলোমিটার। মাঝখানে এক জায়গায় ব্রেকফাস্ট সেরে নেওয়া হল। আরও বেশ কিছুটা যাওয়ার পর দেখা হল ত্রিশূলী নদীর সঙ্গে। এগোতে লাগলো বাস এবং সময়। ত্রিশূলী বাজার পেরিয়ে লাঞ্চ করলাম আমরা। এরই মাঝে চার-চারবার চেকপোস্টে বাস থামিয়ে কীসব কাগজপত্র পরীক্ষা করা হল। এরপর যে রাস্তা শুরু হল সেটা দেখে আঁতকে ওঠার জোগাড়। এবড়ো-খেবড়ো বোল্ডারের ওপর দিয়ে অসম্ভব দুলতে দুলতে এগোচ্ছে বাস, পাশেই নেমে গেছে গভীর খাদ। এক জায়গায় দেখা গেল একটা ট্রাক পড়ে আছে খাদের অতল গভীরে। আমরা কথাবার্তা প্রায় বন্ধ করে শক্ত করে ধরে আছি সিটের হাতল। এভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটল। এরপর আবার এক চেকপোস্ট, এটা ল্যাংটাং ন্যাশনাল পার্কের প্রবেশদ্বার। এবার রীতিমতো যে যার স্যাক খুলে মালপত্র নামিয়ে দেখাতে হল নিরাপত্তা কর্মীদের, দিতে হল প্রবেশ মূল্য। আরও এক কিলোমিটার এগিয়ে যখন ধুনচে পৌঁছালাম, তখন দিনের আলো প্রায় নিভে এসেছে। দশঘণ্টা পর আমরাও একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।
কিছু দোকানঘর, বেশ কিছু হোটেল আর গোঁসাইকুণ্ড কিংবা ল্যাংটাং ভ্যালি ট্রেক করতে আসা মানুষজন – এই নিয়ে রসুয়া জেলার সদর শহর ধুনচে। আমাদের অবশ্য বিশ্রাম করার জো নেই। তরুণদা তাড়া লাগান, আমারা নাকি চার কিলোমিটার দূরে এক জায়গায় বিরল রেনবো ট্রাউট মাছের চাষ হয় সেখানে যাব আর একেবারে টাটকা মাছ খাব। অগত্যা হোটেলে স্যাক রেখে কোন রকমে হাতমুখ ধুয়ে গাড়ি করে বেড়িয়ে পড়ি চার কিলোমিটার দূরের উদ্দেশ্যে। ঘুরে দেখলাম এই এই বিরল মাছের প্রজনন কেন্দ্র। পাশের এক রেস্টুরেন্টের ছাদে বসে ঠাণ্ডার মধ্যে গরম কফির সাথে টাটকা রেনবো ট্রাউট মাছ ভাজা মন্দ লাগেনা। তবে মাছের কিলোপ্রতি যা দাম তাতে কলকাতায় খুব ভালো মানের ইলিশ হয়ে যায়। তবে আসল চমকের তখনো বাকি ছিল - ফেরার সময় নাকি হেঁটে ফিরতে হবে পুরো রাস্তা। কী সর্বনেশে কথারে বাবা! সেই সকাল থেকে একটানা জার্নি করেছি, ভয়ঙ্কর রাস্তার ঠেলায় হাত পা সব খুলে আসার জোগাড় হয়েছে, আর এখন যদি এই অন্ধকারে এতোটা রাস্তা ঠ্যাঙাতে হয়! বেজায় বিরক্তি নিয়ে ব্যাজার মুখে হাঁটতে থাকি। আচমকা কাঁধে হাত রাখেন তরুণদা, বলেন - এই হাঁটাটার দরকার ছিল, কাল খুব কাজে লাগবে। একটিমাত্র হেড ল্যাম্পের আলোতে ঘন অন্ধকারে আমরা চলতে থাকি। স্নিগ্ধাদি গান ধরে "আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণ ..."। বিদেশ বিভূঁইয়ের অচেনা রাস্তা, নির্জন ঘন অন্ধকার, দূরে জোনাকির মত মিটমিটে আলো জ্বলা ধুনচে শহর, ঝকঝকে তারাভরা রাতের আকাশ... সত্যিই বিস্ময়ে তাই জাগে!

যখন ধুনচে এসে পড়ি, ছোট্ট শহরটা ঘুমোবার আয়োজন করছে। হাতমুখ ধুয়ে একেবারে খেতে বসে যাই। একঘেয়ে নেপালি থালির সাথে দু'টুকরো চিকেন পাতে পেয়ে পুলকিত হই। খাওয়ার পর টিম মিটিং হয়। সবাই যে যার স্যাক গোছাই। কাল সকালেই হবে বহু প্রতীক্ষার অবসান, হাঁটতে শুরু করব গোঁসাইকুণ্ডের পথে। সারাদিনের ক্লান্তিতে শোবার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ বুজে আসে।

পরদিন ভোরবেলায় উঠে পড়লাম। জানলা দিয়ে নাম-না-জানা সুন্দর কিছু তুষারশৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে। শীতের কামড় একদম নেই। ঝটপট তৈরি হয়ে নিলাম সকলে। রুটি আলুর তরকারি দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নেমে পড়লাম পথে, সকাল তখন ঠিক আটটা। শরতের সুন্দর সকালে নরম সোনা রোদের মধ্যে এগোতে লাগলাম সবাই। একটু এগোনোর পর বাঁ দিকে একটা মিনারেল ওয়াটার ফ্যাক্টরি পড়ল। এর পর থেকে রাস্তাটা নিচের দিকে নামতে শুরু করল। দূর থেকে কানে আসছে কোনো এক ঝরনার আওয়াজ। চারিদিক সবুজে সবুজ। আর কিছুটা যাওয়ার পর দেখা হল এক নদীর সঙ্গে। এটাই ত্রিশূলী নদী, এর উৎসের দিকেই আমরা যাব। ভারী স্যাকটা নামিয়ে একটু বসি নদীর পাশে। চোখে-মুখে ঠাণ্ডা জল দিয়ে খুব আরাম লাগে। ক্ষণিকের বিরতির পর আবার যাত্রা শুরু। এবার ত্রিশূলী নদীর ওপর ঝুলন্ত সেতু পার করে উল্টো দিকের পাহাড়ে এসে পড়ি।

ধুনচে ছাড়িয়ে

এরপর থেকে একটানা চড়াই। ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ক্রমশ উঠতে থাকি ওপরে। চলতে চলতে সবাই পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। ঘর্মাক্ত শরীরে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সাথে যুদ্ধ করে ঘন্টা দেড়েক চলার পর একটা ছোট হোটেল চোখে পড়ে। চকলেট, ড্রাই ফ্রুটস আর ওআরএস মেশানো জল খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম। আবার দমফাটা চড়াই পথে হাঁটা শুরু হয়। ধীরে ধীরে চলতে চলতে প্রায় আড়াইটার সময় একটা ছোট্ট সমতল জায়গায় উঠে এলাম। এটাই ২৬২৫ মিটার উচ্চতার দেওরালি। শুনেছিলাম ছ'ঘণ্টায় পৌঁছে যাব আজকের গন্তব্য চন্দনবাড়ি, কিন্তু দেওরালি আসতেই ছ'ঘণ্টা লেগে গেল। আমাদের গাইড সুবর্ণ দাজু সামনের এক পাহাড় দেখিয়ে বললেন ওই পাহাড়ের মাথায় আমাদের উঠতে হবে। চন্দনবাড়ি আর কতদূর জিজ্ঞাসা করাতে সুবর্ণ দাজু হাসি হাসি মুখ করে জানালেন, - "অউর থোড়াসা হায়।" স্যুপ নুডলস দিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে আবার পথে নামলাম সবাই। এবার চড়াই আগের থেকেও বেশি। দু'পা হেঁটে দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে, পিঠের স্যাকটাকে জগদ্দল পাথরের মতো মনে হচ্ছে। নিজের নামের প্রতি মর্যাদা দিয়ে তরুণদা চলেন সবার আগে। অর্জুন, সুকান্তদা কিংবা বয়োকনিষ্ঠ টিনটিন এগিয়ে যেতে থাকে ক্রমশ। আমি আর অভিজিৎ ধীরেসুস্থে এগোতে থাকি। কিন্তু প্রাণান্তকর চড়াই যেন আর ফুরোয় না। ওদিকে ঘন জঙ্গলের মাঝে ফুরিয়ে আসে দিন। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পড়ি ডিমসা বলে একটা ছোট্ট গ্রামে। একটা ছোট হোটেলের বারান্দাতে বসি বিশ্রামের জন্য। হোটেলের সাইনবোর্ডে ডিমসার উচ্চতা দেখায় ৩১০০ মিটার। আগের দলটা বোধহয় অনেকখানি এগিয়ে গেছে। আমাদের পিছনে স্নিগ্ধাদি, সঞ্জয়দা সহ চার জন আসছে। এদিকে অন্ধকার ক্রমশ নিবিড় হয়ে আসছে।

চন্দনবাড়ির পথে

বুঝতে পারছিনা পিছনের দলের জন্য অপেক্ষা করব, না অভিজিৎ আর আমি এগিয়ে যাব। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম একটু অপেক্ষা করি স্নিগ্ধাদিদের জন্য। এখানে এক কাপ লিকার চা এর দাম ভারতীয় মুদ্রায় ৫০ টাকা। সময় কাটানোর জন্য এক কাপ চা কিনে দুজনে ভাগ করে খাই। ওদিকে স্নিগ্ধাদি, সঞ্জয়দার দেখা নেই। হোটেল মালিককে জিজ্ঞাসা করা হল চন্দনবাড়ি আর কতটা, ইনি হাসি হাসি মুখে নেপালিতে যা বললেন তার মানে দাঁড়ায়, - অউর থোড়াসা হ্যায়। এতক্ষণে বুঝে গেছি আমাদের 'থোড়াসা' আরা নেপালি 'থোড়াসার' মধ্যে কয়েক যোজন তফাৎ। উপায়ান্তর না দেখে হাঁটতে শুরু করলাম দুজনে। আমি কিংবা অভিজিৎ কেউই রাতের বেলায় ট্রেক করিনি কখনো। দুজনের কারও কাছে হেডল্যাম্পও নেই, ছোট টর্চই সম্বল। আর কতটা যেতে হবে বুঝতেও পারছিনা। তার ওপর রাতের বেলায় পথ হারানোর ভয়ও আছে। বুকের ভিতরটা কেমন খালি খালি লাগতে থাকে। তবু যত সম্ভব দ্রুত এগোতে থাকি। আলগা পাথর আর ডান দিকে নেমে যাওয়া খাড়া খাদকে পাশ কাটিয়ে নিঝুম অন্ধকারে চড়াই ভেঙে উঠতে থাকি। গাছপালার ফাঁকে মাথার উপর উঁকি দেয় মিটিমিটি তারা, একঘেয়ে সুরে ডাকতে থাকে ঝিঁঝিঁ। হঠাৎ এই গা ছমছমে পরিবেশে এক বাঁকের মুখে চমকে উঠলাম ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনে। ওপর থেকে তীর বেগে নিচে নেমে আসছে দুটো ঘোড়া। ঘোড়সওয়ারদের চিৎকার শুনে বুঝলাম আমাদের সরতে বলছে। মুহূর্তের মধ্যে অভিজিতকে নিয়ে খাদের কিনারায় এসে দাঁড়াই। একেবারে গায়ের পাশ দিয়ে হুড়মুড়িয়ে উদাসী রাজপুত্রের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে নিচে নেমে যান স্থানীয় দুজন। সাক্ষাত মৃত্যুর হাত এড়িয়ে হাপরের মতো শ্বাস নিতে নিতে ভাবতে থাকি, ঘোড়সওয়ারদ্বয় শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে তো! ক্রমে মিলিয়ে আসে ঘোড়ার খুরের শব্দ। বিধ্বস্ত শরীরে কোন রকমে উঠতে থাকি। ঠিক তখনি বহু ওপরে চোখে পড়ে কিছু আলো। কেউ যেন টর্চ জ্বেলে সংকেত দিচ্ছে। বুঝি ওটা তরুণদা বা অর্জুন। আমরাও টর্চের সংকেত দিই। আরও আধঘণ্টা পর এসে পৌঁছাই আজকের আস্তানা চন্দনবাড়ি গ্রাম যার আর এক নাম শিং গোম্ফা। শরীর একেবারে অবসন্ন। ছুটে এসে কাঁধ থেকে স্যাক খুলে নেয় অর্জুন, বাকিরা হাত ধরে বসায় আমাদেরকে। তরুণদা এগিয়ে দেন চায়ের কাপ। মনে মনে ভাবি এই জন্যই তো ট্রেক করতে আসা, এই ভালবাসা, এই সহমর্মিতা আর কোথায় পাব! একটু সুস্থ হয়ে হিসেব করে দেখি আজ সাড়ে দশ ঘণ্টা হেঁটেছি। শুরু করেছিলাম ধুনচের ১৯৫০ মিটার থেকে শেষ করেছি এখানে ৩৩০০ মিটার উচ্চতায়। একদিনে উচ্চতা অর্জন করেছি ১৩৫০ মিটার বা ৪৪৫০ ফুট ! আরও আধঘণ্টা পর একইরকম বিধ্বস্ত অবস্থায় স্নিগ্ধাদিসহ বাকী চারজন এসে পড়ল। সামান্য ডাল ভাত তরকারি মুখে দিয়ে সর্বাঙ্গে ব্যথা নিয়ে শুয়ে পড়ি, বাইরে তখন হাড়কাঁপানো ঠান্ডা।

নাম-না-জানা তুষারশৃঙ্গ

পরদিন সকালে অনেকটা সুস্থ লাগে নিজেকে। আমাদের হোটেলের ঠিক উল্টো দিকেই একটা ছোট বৌদ্ধ মনাস্ট্রি চোখে পড়ে। প্রাচীন এই মনাস্ট্রির নাম অনুসারেই চন্দনবাড়িকে শিং গোম্ফাও বলে। আজই আমরা ৪৩৮০ মিটার উচ্চতায় গোঁসাইকুণ্ড পৌঁছাব। প্রথম দিকে রাস্তা প্রায় সমতল। দুপাশে গাছের নিবিড় ছায়ায় এগিয়ে চললাম। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর উত্তর দিগন্তে অনেকগুলি তুষারশৃঙ্গ দেখা গেল, সুবর্ণ দাজু সঙ্গে না থাকাতে এদের নাম আর জানা হল না। গাছের আড়ালে এই সব নাম-না-জানা শৃঙ্গের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে পৌঁছে গেলাম চোলাংপাতি। এখানে তিব্বতী প্যানকেকের সঙ্গে মধু দিয়ে চমৎকার ব্রেকফাস্ট সেরে ফেললাম আমরা। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর এবার হাঁটা শুরু লাওরিবিনার উদ্দেশ্যে। আর গাঞ্জালা পাস।

লাওরিবিনার পথে

এবার পথটা পুরোপুরি চড়াই। চলতে চলতে ক্রমে ফুরিয়ে আসে বড় গাছপালা। প্রায় ৪০০০ মিটার উচ্চতায় ভারী স্যাক পিঠে নিয়ে চড়াই ভাঙতে হাঁফ ধরে যায়। দু'পা এগিয়েই দাঁড়িয়ে পড়তে হয় একটু অক্সিজেনের জন্য। বেশ সময় লাগে লাওরিবিনা আসতে। এখানে ২০১৫ সালের নেপালের ভয়াবহ ভুমিকম্পের কিছু নিদর্শন চোখে পড়ে। এক হোটেলে মধ্যাহ্নভোজন সারতে বসি। কিন্তু সেই একই কালো ডাল, শাকপাতা সিদ্ধ আর আলু ছোলার তরকারি আর মুখে রোচে না। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার পথে নামি। পরবর্তী গন্তব্য ৪২০০ মিটার উচ্চতার বুদ্ধমন্দির। রাস্তা বেশ চড়াই, তবে দূরত্ব খুব বেশি নয়। এখানে বোধহয় এককালে কোন ছোটোখাটো বৌদ্ধ মনাস্ট্রি ছিল, ভূমিকম্পের কারণে এখন আর কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই। অবশ্য ছোট এক সুন্দর বুদ্ধ মূর্তি আছে। আগে শুনেছিলাম এখান থেকে গনেশ হিমাল এবং পুরো ল্যাংটাং রেঞ্জ সহ প্রচুর তুষার শৃঙ্গ দেখা যায়। কিন্তু নেপালে আসার পর আজই প্রথম দেখি আকাশে মেঘের আনাগোনা। একটু বিরতির পর ফের হাঁটা শুরু। এবার চড়াই অনেক কম, তবে বিকেল দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। আজ আমি, অভিজিৎ আর অর্জুন একসঙ্গে চলেছি। বৃক্ষরেখা শেষ হয়ে গেছে লাওরিবিনাতেই, এখন চারপাশে শুধুই রুক্ষ নেড়া কালো রঙের পাহাড়।

ভৈরব কুণ্ড

একটা বাঁক ঘুরতেই তিনদিকে পাহাড়ের কোলে, অনেক নিচে একটা ছোট নীল রঙের জলাশয় দেখা গেল। এটি বোধহয় সরস্বতী কুণ্ড। আরও কিছুটা এগিয়ে আরও একটা কুণ্ড, এটা আকারে বেশ বড়। ম্যাপ অনুসারে এটি ভৈরব কুণ্ড। শুনেছিলাম এই এলাকায় নাকি ছোট বড় মিলিয়ে একশ আটটি কুণ্ড বা প্রাকৃতিক জলাশয় আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়

আর পবিত্র হল গোঁসাইকুণ্ড। নীল জলের টলটলে ভৈরব কুণ্ডের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল আমরা যেন স্বপ্নের ভিতর হাঁটছি। মেঘলা বিকালের মন খারাপকরা আলোতে মায়াবী লাগছে চারপাশ। দেখতে দেখতে কালো হয়ে এল নীল জল -সন্ধ্যা নেমে আসছে। ঠিক তখনই অনেক দূরে কিছু বাড়ি ঘরের টিনের চাল চোখে পড়ল। বুঝলাম গোঁসাইকুণ্ড আর খুব দূরে নেই। হাল্কা চড়াই পথ পেরিয়ে যখন আমাদের স্বপ্নের গোঁসাইকুণ্ডে পৌঁছলাম তখন অন্ধকার নেমে এসেছে আর টিপটিপ বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, আর সেইসঙ্গে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। গোঁসাইকুণ্ড দেখা আর পুজো দেওয়া তোলা রইল কাল সকালের জন্য। উঠলাম পাশের এক কাজ চালানোর মতো কাঠের তৈরি হোটেলে। কমবেশি আমরা সবাই ক্লান্ত বিধ্বস্ত। তার ওপর উচ্চতার জন্য গা বমি, মাথাযন্ত্রণা তো আছেই। আজকেও প্রায় দশ ঘণ্টা হেঁটেছি। দুদিনে ১৯৫০ মিটার থেকে ৪৩৮০ মিটার উচ্চতার এই গোঁসাইকুণ্ড উঠে এসেছি। কোনরকমে রাতের খাওয়া সেরে ঢুকে পড়লাম লেপের নিবিড় আশ্রয়ে। সারা রাত একটুও ঘুম হল না, শুধু আমি নই, প্রায় সবারই এক অবস্থা।

কাকভোরে চলে এলাম গোঁসাইকুণ্ডের পাশে। ভোরের স্নিগ্ধ আলোতে চারপাশের পাহাড়ের কোলে সযত্নে বেড়ে ওঠা গোঁসাইকুণ্ড দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। লেকের জল এতটাই নীল, যে মনে হয় তুলি ডুবিয়ে রঙ করা যাবে। ক্রমে পুব আকাশে রঙ ছড়িয়ে পড়ল, পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে সূর্য উঠল, সকালের সোনা রোদ লুটোপুটি খেতে লাগলো গোঁসাইকুণ্ডের জলে। পাশেই টিনের চালের এক ছোট মন্দির। অধিষ্ঠাতা দেবতা গোঁসাই অর্থাৎ মহাদেব। তাঁর ত্রিশূলের আঘাতেই এই গোঁসাইকুণ্ডের জন্ম, আর এর থেকে উৎপত্তি নেওয়া নদীর নাম ত্রিশূলী। আমরা ধূপ জ্বালিয়ে, কাজু, কিসমিস আর চকোলেট দিয়ে পুজো দিলাম, বসে থাকলাম জলের পাশে পাথরের ওপর। তাড়া লাগান তরুণদা - এবার যে আমাদের ফিরতে হবে, পাড়ি দিতে হবে অনেকখানি পথ। দ্রুত স্যাক গুছিয়ে গোঁসাইকুণ্ডের নীল জলের হাতছানিকে পিছনে ফেলে ফের পথে নামলাম...

গোঁসাই কুণ্ড

~ *ল্যাংটাং-গোঁসাইকুণ্ড ট্রেকরুট ম্যাপ* ~ *গোঁসাইকুণ্ড ট্রেকের আরও ছবি* ~

পদার্থবিজ্ঞানের স্নাতক পল্লব চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাণিজ্য কর দফতরের আধিকারিক।ভালোবাসেন নানা ধরণের বই পড়তে। নেশা ব্যাগ ঘাড়ে করে পরিবারের কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে কাছে বা দূরের ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়া। বেশি পছন্দের পাহাড় আর বন। এক সময় দার্জিলিং-এ চাকরি করেছেন বেশ কিছু দিন। সেই থেকে পাহাড়ের সঙ্গে মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে পড়া।

tell a Friend

রহস্যময় ডাইনোসর বিচ

মার্জিয়া লিপি

ইচ্ছেটা অনেকদিন ধরেই ছিল – ২০১৮-এর অক্টোবরে মালয়েশিয়া আর ইন্দোনেশিয়ার বালি ভ্রমণের জন্য মালিন্দো এয়ারলাইনসে টিকিট বুকিং করলাম। ক্রিসমাসের ছুটির পর বারো দিনের একটা ভ্রমণসূচির খসড়াও করে ফেললাম। পরিকল্পনার প্রথম চারদিন মালয়েশিয়া আর পরের আটদিন ছিল বালির জন্য নির্ধারিত। শুরুতে ভ্রমণসঙ্গী ছিল সাতজন, পরবর্তীতে বেড়ে সে সংখ্যা দাঁড়ায় দশজনে। সর্বকনিষ্ঠ সদস্য দ্রাবিড়ের বয়স সাড়ে চার আর বয়োজ্যেষ্ঠ বিশ্বজিৎ ভাদুড়ী দাদার বয়স চুয়ান্ন। সহকর্মী রহুল ভাই এয়ার টিকিট কিনেও শেষ পর্যন্ত আর অফিসের কাজের জন্য যোগ দিতে পারলেন না।

ভ্রমণসূচিতে স্থির হল ৩১ ডিসেম্বরে বালির কুটা বিচের বিখ্যাত আতসবাজি দেখব। বালি মূলত: ইন্দোনেশিয়ার একটা দ্বীপরাজ্য। আর ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপের দেশগুলোর অন্যতম। তেরোহাজারের বেশি দ্বীপ জীববৈচিত্র্য আর সাংস্কৃতিক বৈচিত্রে অনন্য দেশটি। বিখ্যাত সবচেয়ে বড় ফুল রাফলেশিয়া অ্যারনোল্ডি আর গ্রেটার বার্ডস অব প্যারাডাইসের জন্য।

ইন্দোনেশিয়ার উৎপত্তি গ্রীকভাষায় 'ইন্দোস' আর 'নেসস' থেকে যার অর্থ ইন্ডিয়ান আইল্যান্ড। প্যাসিফিক রিং অব ফায়ার-এ অবস্থিত দেশটির মাটি ভূগাঠনিক ভাবে খুব অস্থির। চারশোটি আগ্নেয়গিরি রয়েছে ইন্দোনেশিয়ায় -যার মধ্যে একশো তিরিশটিই সক্রিয়। গত কয়েকবছরে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ আর সুনামির কারণে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এদেশটি বার বার সংবাদ শিরোনাম হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক। বছরে দুটি ঋতু দেখা যায়- বর্ষা এবং শুষ্ক। বিষুবরেখা বরাবরে অবস্থিত দেশটির তাপমাত্রা খুব বেশি উষ্ণ বা শীতল নয়। চৌত্রিশটি প্রদেশ রয়েছে ইন্দোনেশিয়ায় - যার মধ্যে জাভা, বালি এবং লুম্বক আয়তনের দিক থেকে বড়।

বালি বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবাল দ্বীপ - নুসা পেনিডা, নুসা লেম্বানগান, নুসা কেনিঙ্গন নিয়ে গঠিত। পাশেই রয়েছে লুম্বক প্রদেশের বিখ্যাত আরো কিছু দ্বীপ। এসব দ্বীপের প্রত্যেকটিতে রয়েছে নিজস্ব স্বতন্ত্র সংস্কৃতি আর বৈশিষ্ট্য। দিনে-রাতে কমপক্ষে দ্বীপগুলোর তিনবার এসব প্রবাল দ্বীপের সৌন্দর্য আর বৈশিষ্ট্য বদলে যায়। সূর্যোদয়ের পর স্নিগ্ধ আর রাতের আলো-আঁধারের নীরবতায় দ্বীপরাজ্য যেন সৌন্দর্যের ভিন্ন পসরায় নিজেকে সাজায়। বালি ভ্রমণে অধিকাংশ পর্যটকই ভ্রমণের তালিকায় দ্বীপ - নুসা লেম্বানগান, নুসা পেনিডা এবং গিলি ট্রায়নগানকে অন্তর্ভূক্ত করে।

আমাদেরও আটদিনের বালি পর্বের ভ্রমণসূচিতে ছিল - কুটা আর উবুদের বিভিন্ন দর্শনীয় মন্দির - তানাহলট, উলুয়াতু, নুসা দুয়া সমুদ্র সৈকত, ড্রিম বিচ, পাদাংপাদাং সিক্রেট সমুদ্র সৈকত, জিমবারান বিচে সামুদ্রিক মাছে ক্যান্ডেল ডিনার, থার্টিফাস্ট নাইটে কুটা বিচের আতসবাজি, উবুদের রাইস টেরেস, আর্ট গ্যালারি, কফি প্ল্যানটেশন, ট্রারাঙ্গান জলপ্রপাত, জীবন্ত আগ্নেয়গিরি - কিন্তামানি, মাংকি ফরেস্ট, বার্ড জু ইত্যাদি। দ্বীপের তালিকায় রেখেছিলাম নুসা লেম্বানগান, নুসা কেনিঙ্গন, নুসা পেনিডা এবং গিলি ট্রায়নগানকে।

ভ্রমণের শুরুতে খুব উত্তেজনায় ছিলাম বালির কোরালদ্বীপ ভ্রমণ এবং পানির নীচের বিভিন্ন অ্যাকটিভিটি নিয়ে।

স্কুবা ড্রাইভিং এবং স্নর্কেলিং-এর জন্য বালি এবং লুম্বকের গিলি দ্বীপগুলো খুব বিখ্যাত। পানির নীচের জীববৈচিত্র্য অসাধারণ বর্ণিল ও অন্য রকম বিস্ময়কর। ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণের ষষ্ঠদিনে আমরা রওনা দেই নুসা লেম্বানগান থেকে নুসা পেনিডায়। নুসা পেনিডা দ্বীপে যে কয়টি আকর্ষণীয় স্থান রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ডাইনোসর বিচ বা কেলিংকিং বিচ। নীলাভ-সবুজ পানি, সোনালি ঝকঝকে রোদ আর মাখন রঙের সাদা সৈকতে ডাইনোসর আকৃতির বিচটি বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র ও

অনন্য।

নুসা লেম্বানগানে আসতে হয় কুটার সেনোর বিচ থেকে ফাস্টবোটে। সৈকতের একেবারে কিনারায় অবস্থিত - স্বপ্নের মত সুন্দর একটা রিসর্ট - নুসা লেম্বানগানের মহাগিরি। প্রবালদ্বীপের কাচের মত স্বচ্ছ নীল পানি আর মহাগিরির সুইমিং পুল। রাত্রিযাপন শেষে ভ্রমণসঙ্গীদের ঘুমের মধ্যে রেখেই আমি আর সূর্য একটা মোটরবাইক নিয়ে রওনা দিলাম নুসা পেনিডার উদ্দেশ্যে। সেদিন ছিল বালিতে 'গালুনগন' উৎসব। প্রতি ছয়মাস পর পূর্ণিমা তিথিতে 'গালুনগন' উৎসব পালিত হয়। রঙ-বেরঙের বিভিন্ন পোশাক পড়ে মাথায় পূজার নৈবেদ্য নিয়ে ভিড় করে ছোট-বড় সকলেই বিভিন্ন মন্দিরে যান। বছরকয়েক ধরে এই দ্বীপটি অন্যরকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে পর্যটকদের কাছে পরিচিতি পেয়েছে। মোটরবাইকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট যাওয়ার পর ইয়েলো ব্রিজের নিচে টিকিটকাউন্টারের পাশে বাইক পার্ক করে স্পিডবোটের টিকিট কিনে নিলাম লাল রঙের এক লক্ষ রুপাইয়া দিয়ে যা বাংলাদেশের টাকায় মূল্যমান ছয় শত। মোটরবাইকের নম্বরসহ একটা ফোটোগ্রাফ তুলে নিলাম যাতে ফিরতি পথে একই রঙের কালো বাইকের সমুদ্র থেকে নিজেদের বাইকটা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। রওনা করলাম স্পিডবোটে - সবুজ রঙের পানির বুক চিরে রাজহংসীর মত। আধঘন্টার জলপথ পাড়ির শেষে পেলোবন হারবারে নেমে পুনরায় আরেকটি বাইক ভাড়া নিলাম ভরপেট পেট্রোলসহ সত্তরহাজার রুপাইয়ার বিনিময়ে। অগ্রিম টাকা শোধ করে রওনা দেওয়ার পূর্বে মোটরবাইকের মালিক জানালেন ফেরার পর তাঁকে না পেলে অপেক্ষার প্রয়োজন নেই। চাবি মোটরসাইকেলে রেখে চলে গেলেই হবে। সেখানে নাকি এরকমই রেওয়াজ। একথা শুনে মনে মনে তুলনা করলাম -জাতিগত ভাবে আমাদের দৈন্যদশার কথা।

আমরা চলছি পাহাড়ি উঁচু-নীচু পথ বেয়ে। কিছুদূর পরপর আবার পিচঢালা রাস্তা, অনেকটা আমাদের দেশের রাঙামাটি যাওয়ার রাস্তার মত। পথে অনেক বিদেশি ও বিদেশিনীকে দেখলাম স্কুটি এবং বাইক চালাচ্ছে। স্মার্টফোনে জিপিএস দেখে দেখে পথ চলেছি। মাঝেমধ্যে রাস্তা ভুল করে স্থানীয় পথচারীদের জিজ্ঞেস করে আবারও সঠিক পথের সন্ধান মিলছে। প্রায় ঘন্টাখানেক মোটরবাইকে চলার পর রাস্তা ভুলে সামনে চলে গিয়ে পুনরায় তীরচিহ্নিত সঠিক পথের সন্ধান খুঁজে পাই। কিছুদূর যাওয়ার পর রাস্তা কোথাও কোথায় বেশ ভাঙা। স্থানীয় মানুষজন খুবই সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের। পাহাড়ি রাস্তায় যদি বাইক চালানোর পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকে তবে হঠাৎ করে অ্যাডভেঞ্চার না করাই ভালো। প্রায় দেড়ঘন্টা টানা গাড়ি চলার পর দেখা মিলল নুসা পেনিডার অন্যতম আকর্ষণীয় ডাইনোসর বিচ বা কেলিংকিং বিচের পার্কিং এলাকার। প্রবেশের জন্য টিকিট কিনত হল পঞ্চাশহাজার রুপাইয়া দিয়ে। মোটরবাইক রেখে অন্যদের অনুসরণ করে কিছু দূর যাওয়ার পরই চোখের সামনে ভারত মহাসাগরের এক অপরূপ রূপের দেখা মিলল।

সবুজ গাছপালা পেরিয়ে সাদা সৈকতের পর দিগন্তজোড়া স্বচ্ছ নীলাভ সবুজ রঙের সমুদ্র। অনেক পর্যটক এখানে এসে এর উপরিভাগের সৌন্দর্য দেখে চলে আসেন কিন্তু বালি ভ্রমণের প্রথম থেকেই আমার খুব ইচ্ছা ছিল ডাইনোসর বিচ-এর সিক্রেট পয়েন্টে যাওয়ার। উপরিভাগ থেকে সৌন্দর্য দেখে আমরা নিজেদেরকে আর থামাতে পারলাম না।

পাহাড় আর সমুদ্রের দুর্গম প্রকৃতির বন্য সৌন্দর্য বড়ই মুগ্ধ করে আমাকে।

নুসা পেনিডার কেলিংকিং বিচের উপরিভাগে পর্যটকদের জটলা। স্মার্টফোন আর ক্যামেরায় বিভিন্নভাবে ছবি তুলে স্মৃতিতে রেখে দিচ্ছে রহস্যময় সৈকতটিকে। সারা গায়ে উল্কিআঁকা ব্রাজিলের এক বিখ্যাত মডেলের ফোটোশ্যুট চোখে পড়ল। পায়ে হেঁটে নীচে নামার সময় কেউ বলছে চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিট, কেউবা বলছে আরো কিছু বেশি সময় লাগবে। বারবার আমি সূর্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম। একপর্যায়ে তাকিয়ে বললাম, ভয়ের কি আছে? আমাদের তো একদিনে চোদ্দ ঘন্টা পাহাড়ে হাঁটার অভিজ্ঞতা রয়েছে; এ আর এমনকী?

এভাবে কোনোরকম প্রস্তুতি ছাড়াই সিক্রেট বিচের জন্য রওনা হলাম। পাহাড় বেয়ে কিছু দূর নীচে নামার পর গাছপালার মাঝখান দিয়ে ডাইনোসর বিচে যাওয়ার জন্য পথ পেয়ে গেলাম। খানিক পথ অতিক্রম করে দেখতে দেখতে ডাইনোসরের মাথার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

প্রথমে একটু সহজই মনে হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ধাপে যাওয়ার পরই আসল রহস্যের শুরু হল। খুবই সরু পাহাড়ি পথ। দু'পাশ একদম ফাঁকা। শুধু কিছু চিকন চিকন লাঠি ও বাঁশ দিয়ে সিঁড়ির হাতলের মতো করে বানানো। বিভিন্ন উচ্চতার এলেবেলে সিঁড়ি। মনে হলো ভুটানে টাইগার নেস্টে যাওয়ার সময় ওপরে উঠে তেরশো সিঁড়ি অতিক্রম করেছিলাম কিন্তু এবারের অভিজ্ঞতা একেবারে ভিন্ন। সরু কাঠ আর বাঁশ ধরেই সবাইকে নীচে নামতে হচ্ছে, পাথরের খাঁজে খাঁজে কোথাও একটু প্রশস্ত পথ, কোথাওবা সরু পথ। একসঙ্গে দু-তিনজন ওঠানামা করা যায় না। দাঁড়িয়ে অন্যকে পাশ দিতে হয়। ট্রেকিং-এর সময় সঙ্গে করে খাওয়ার সেলাইন,পানি ও গ্লুকোজ নিয়ে যেতে হয়। কোরাল, পাথর, বালি আর বাতাসে আর্দ্রতার জন্য প্রচুর ঘাম হয়। শরীর থেকে লবণ বের হয়ে রক্তের চাপ কমে যেতে পারে। আবহাওয়া আর্দ্র থাকলেও দুর্ঘটনার সম্ভবনা থেকে যায়,কারণ নীচে নামার পথটা অনেক খাড়া,একটু স্লিপ করলেই বিপত্তি ঘটে যেতে পারে। মিনিট বিশেক পর প্রচন্ড গরম আর তাপে একসময় মনে হল বৃষ্টির মতো পানি ঝরছে গা থেকে। নীচে নামতে গিয়ে শরীরের ক্লান্তি আর অবসাদে মনে হল আবারও একই পথে ফিরতে হবে।

ডাইনোসর বিচের সামনের তিনদিকের সৌন্দর্য যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। নীল স্বচ্ছ পানিতে জোয়ারের সময় সিক্রেট পথটি ডুবে যায়। পানিতে ভরে যায় ডাইনোসরের নীচের দিকের গোপন সুড়ঙ্গপথটি। তৃষিত মুগ্ধ নয়নে চারপাশের সবুজ আর নীলের জলরাশি দেখছিলাম,দেখছিলাম প্রকৃতি আর ওপরের নীল আকাশকে। প্রচন্ড তাপদাহে আর ঝকঝকে রোদে ক্যামেরায় কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি ওই পানিতে হেঁটে হেঁটে কিছুদূর গিয়ে একদম সামনে থেকে সাগরের ঢেউয়ের খেলা দেখে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম ফেরার জন্যে। হাতে সময় সীমিত,সেলফোনে নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছেনা তাই অনুভব করছিলাম নুসা লেম্বোগানে থাকা ভ্রমণ সঙ্গীরা আমাদের জন্য দুঃশ্চিন্তায় আছে। তাছাড়া কুটায় ফেরার উদ্দেশ্যে ফাস্টবোট ছেড়ে যাবে বিকাল সাড়ে চারটায়। ঘড়িতে দুপুর সাড়ে এগারোটা দেখে আর দেরী না করে সিক্রেট বিচ থেকে মই ধরে ওপরে উঠতে শুরু করি। ডাইনোসরের মাথায় উঠে ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীর মাধ্যাকর্ষণ বলের বিপরীত দিকে ঠেলে এগোতে থাকি গন্তব্যে। অতিরিক্ত ঘামের কারণে শরীরে কোনো শক্তিই যেন অবশিষ্ট নেই। মুখের ভেতরে একটা কাঁচা আমের ললিপপ মুখে পুরে রেখেছিলাম যেনো গলা শুকিয়ে না যায়। তবুও অতিরিক্ত ঘামে আর গরমে গলা শুকিয়ে যেন কাঠ।

আবার চলা শুরু করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাইনোসর সিক্রেট বিচের নীলাভ-সবুজ পানি আমাদের সামনে দৃশ্যমান হল। এই পথ পাড়ি দিতে চল্লিশ মিনিট সময় লাগল। বিচে নামার একদম শেষপর্যায়ে পর্যটকদের সুবিধার জন্য একটা মই লাগানো আছে, সেই মই বেয়ে কেলিংকিং সিক্রেট বিচে পা রাখলাম।

বিচের একপাশে কিছু গাছ রয়েছে। অনেক পর্যটক সেখানে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। তেমন মানুষ নেই, সবেমোট বারো-পনেরো জন হবে। ছায়াঘেরা গাছের এক পাশে কিছু স্থানীয় মানুষ কোমল পানীয় ও পাহাড়ি ফলের পসরা সাজিয়ে বসে আছে। আমাদের হাতে সময় কম তাই ছায়াঘেরা গাছের নিচে একটুক্ষণই বিশ্রাম নিলাম।

চারপাশের মনোরম পরিবেশের সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনার অতীত। দু'পাশ ঘিরে বিশাল উঁচু পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে সবুজ গাছপালা আর নীল আকাশ আর নীলাভ সমুদ্রের জলরাশি মিলে মিশে একাকার। হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর গেল। প্রায়

বারোটা, আমাদের বিদায় ঘণ্টা বেজে গেছে। যেতে হবে, নুসা পেনিডা থেকে ল্যাম্বাগানে তা নাহলে বালিতে ফিরে যাওয়ার ফার্ষ্ট বোট আমাদের রেখেই চলে যাবে।

আর দেরি না করে তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে গেলাম। আবার অভিকর্ষ বলের বিপরীতে ওপরের দিকে বেয়ে উঠতে হবে। হাতের ওপর ভর দিয়ে দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। উঁচু-নিচু সিঁড়ি; প্রায় চল্লিশ মিনিট পাহাড়ি পথ বেয়ে গন্তব্যের প্রায় নব্বই শতাংশ অতিক্রম করার পরই ঘটল বিপত্তি। অতিরিক্ত ঘামে রক্তচাপ কমে যাওয়ায় চোখ অন্ধকার হয়ে গেল। সিঁড়ির একপাশে বসে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে বাতাস থেকে অক্সিজেন নিচ্ছিলাম। সূর্যের কথামতো মাথা কিছুক্ষণ নিচের দিকে ঝুঁকে অপেক্ষা করছিলাম। ক্রমেই দৃষ্টিসীমা ঝাপসা থেকে স্পষ্ট হয়ে এল। আবারও পথ চলতে শুরু করে দশ মিনিটের মধ্যে ওপরে উঠে এলাম। লবণের অভাব পূরণের জন্যে ঢাউস সাইজের দুটো ডাব খেয়ে নিলাম। বরফ ঠান্ডা পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে রেস্তরাঁ থেকে হালকা কিছু খেয়ে নিলাম। রেস্তরাঁর পাশেই ছিলো একটা কালোজামের গাছ। হাতের নাগাল থেকে কয়েকটা জাম পেরে মুখে দিতেই মিষ্টিস্বাদের রসে ভরে গেল মুখ। রেস্তোরাঁয় কথা বলে আরও কিছু জাম পেরে নিলাম নুসা লেম্বাগানে থাকা কন্যা ভোর আর সঙ্গীদের জন্যে। প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে পথে মধ্যে নাসি গোরেং আর চিকেন সাটো দিয়ে আগে ভাগেই মধ্যাহ্ন ভোজ সেরে নিলাম।

দেড়ঘণ্টা চড়াই-উৎরাই-এর পর মোটরবাইকে আমরা নুসা পেনিডায় - ব্যালাবন হারবার জেটিতে পৌঁছে একটা স্পিডবোটে আধ ঘন্টায় ফিরে আসি ইয়েলো ব্রিজে। ব্রিজের অপরপাশের নুসা কেনিঙ্গনের ব্লু লেগুন আর সিক্রেট ব্রিজে যাওয়ার লোভ সম্বরণ করে চলে এলাম নুসা লেম্বাগানের মহাগিরিতে অপেক্ষারত ভ্রমণ সঙ্গীদের কাছে।

বিকাল সাড়ে চারটেয় আমাদের ফাস্টবোট দুর্বার গতিতে ভারত মহাসাগরের বুক চিরে এগিয়ে গেল সেনোর বোটজেটির দিকে। যতই এগিয়ে যাচ্ছিলাম, ততই বিষন্নতায় মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে আসছিল।

হাঁটুপানিতে নেমে আমরা ঘাটে চলে এলাম। এদিকে ড্রাইভিং পার্কে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল দুটো অ্যাভেঞ্জা ব্রাণ্ডের গাড়ি। গল্প করতে করতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসি কুটা বিচে আমাদের বাকুম বিচ রিসর্টে।

এই দ্বীপগুলোতে যেতে হলে ভ্রমণকারীদের যা করতে হবে:
ফাস্টবোটে চেপে যেতে হবে। বালিতে সেনোর নামে একটা বোটঘাট আছে ওখান থেকেই এই সব দ্বীপে যাওয়ার জন্য ফাস্টবোট সার্ভিস পাওয়া যায়। সকাল সাতটা থেকে শুরু করে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত বোট সার্ভিস চলে। ইন্দোনেশিয়ান মুদ্রায় ৪৫০,০০০/- থেকে ৫৫০,০০/- রুপিয়া বা বাংলাদেশি টাকায় ২৮৫০/- থেকে ৩৪৫০/-এর ভিতর এই সব দ্বীপে যাওয়া-আসার টিকেট পাবেন। অনলাইনে অথবা হোটেলের আশেপাশের বিভিন্ন স্থানীয় দোকান থেকে এইসব দ্বীপে যাওয়ার জন্য তথ্য পাওয়া যাবে। দ্বীপগুলিতে যাওয়ার জন্য কিছু প্যাকেজও পাওয়া যায় অথবা বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ভালভাবে জেনে নিজে নিজেই সব ব্যবস্থা করা যায়।

সতর্কতা:
সবুজ বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নুসা পেনিডা ছবির মত সুন্দর আর পরিচ্ছন্ন। তাই অপরূপ এই দ্বীপটিকে কোনোভাবে অপরিচ্ছন্ন করা উচিত নয়। কোরালদ্বীপে পলিথিন ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে। শরীরের পানিশূন্যতা এড়ানোর জন্যে ট্রেকিং-এর সময় সঙ্গে খাওয়ার সেলাইন,পানি ও গ্লুকোজ নিয়ে যেতে হবে।

মার্জিয়া লিপি প্রাবন্ধিক ও পরিবেশবিদ। প্রকাশিত বইঃ 'আমার মেয়েঃ আত্মজার সাথে কথোপকথন, ৭১ মুক্তিযোদ্ধার মা, বাংলাদেশের উপকূল: পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য, জীবনীগ্রন্থ - সরদার ফজলুল করিম, সম্পাদিত বই: সরদার ফজলুল করিম দিনলিপি, মাঃ দুইবাংলার সাহিত্য সংকলন, শিশু বিশ্বকোষ ইত্যাদি।

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

ইচ্ছাপূরণের মুলকারখায়

গৌতম দে

~ মুলকারখার আরও ছবি ~

এবারের ঘুরতে যাওয়াটা প্রথম থেকেই একটু অন্যরকম করার ইচ্ছা ছিল। অন্যরকম মানে মানুষের ভিড় থেকে দূরে প্রকৃতির কোলে কয়েকটা দিন কাটানো। ইন্টারনেটের সৌজন্যে এরকম একটা জায়গার খোঁজ পাওয়াও গেল। মুলকারখা লেক, একটা ছোট্ট সরোবর এবং সেটা এতটাই ছোট যে ম্যাপ ঘেঁটে খুব কষ্ট করে খুঁজে বের করতে হয়। জায়গাটা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অতি সীমিত। তবে এটুকু জানা গেল যে মুলকারখা যেতে গেলে ট্রেক করে যেতে হবে। দুদিনের ট্রেকরাস্তার বেশিরভাগটাই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। যথাসময়ে দার্জিলিং মেলের টিকিট কেটে,ব্যাগবোগালি নিয়ে আমরা চারজন রওনা হয়ে পড়লাম।

ভারতীয় রেলের তথাকথিত মর্যাদা বজায় রেখে ট্রেন প্রায় এক ঘন্টা লেটে নিউজলপাইগুড়ি পৌঁছাল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা অটো ভাড়া করে SNT বাসস্ট্যান্ড।সকাল সাড়ে নটা। বাস যখন ছাড়ল, শিলিগুড়িতে হালকা ঠান্ডার অনুভূতি। সেবক কালীবাড়ি পর্যন্ত যথেষ্ট ট্রাফিক জ্যাম ঠেলতে ঠেলতে বাস চলছে। রাস্তা বেজায় খারাপ। এইভাবে প্রায় আড়াইঘন্টা পর সিকিমের সীমানা রংপো পৌঁছানো গেল। এখানে বলে রাখা ভালো, ট্যুর বুকিং করার সময় কেউ চাইলে লিংসে পর্যন্ত গাড়িও বুক করা যায়। রংপোতে লাঞ্চ সেরে একটা ছোটো গাড়ি ভাড়া করে চলে এলাম লিংসে।এখানে আবার আমরা প্রবেশ করলাম পশ্চিমবঙ্গে।

লিংসের কথা বলতে গেলে বলতে হয় প্রকৃতির মাঝে কয়েকঘর মানুষের বাস। যারা সত্যি প্রকৃতিকে ছুঁতে চায় তাদের জন্য আদর্শ গন্তব্য। আমাদের ওয়েলকামসং-টা পাখিদের কাকলিতেই খুঁজে পেলাম যেন। এখানে সবজায়গাতেই হোমস্টেতে থাকা। যাঁর বাড়িতে আমরা অথিতি সেই ললিতজী আবার জোর করে আমাদের লাঞ্চ করালেন। এরপর বেরোনো হল একটা ছোট ঝরনা দেখতে। জঙ্গলের মাঝবরাবর রাস্তা। প্রায় বুকসমান উঁচু এলাচ গাছের বনের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলাম ঝরনার কাছে। কিছুক্ষণ ঝরনার পাশে কাটানোর পর ফিরে এলাম বাড়ি। ওদিকে অনেকক্ষণ ধরেই চলছে আকাশে মেঘেদের ডাকাডাকি। বৃষ্টি হতোই,হতেই হত। কিন্তু যেটা হল তার অভিজ্ঞতা জীবনেও ভোলার না! ভীষণ জোরে শিলাবৃষ্টি শুরু হল। এত শিল পড়ছিল, মনে হচ্ছিল যেন টিনের ছাদ ফুটো হয়ে যাবে। প্রায় পনেরো মিনিট শিল পরার পর সব শান্ত, আস্তে আস্তে ঠান্ডা নামছে পাহাড়ে। শান্ত পাহাড় কেমনভাবে ঘুমের দেশে হারিয়ে যায়, দেখিয়ে দিল।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টে মোমো। সেরেই হাঁটা শুরু হল ঝুসিং-এর উদ্দেশ্যে। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা পাথুরে রাস্তা। দমের ঘাটতির জন্য থেমে থেমে প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করতে করতে হাঁটা। তিনঘন্টা হাঁটার পর পৌঁছে গেলাম ঝুসিং। জঙ্গলের মাঝখানে একটু ফাঁকা জায়গা আর তার মাঝখানে কয়েকটা কাঠের ঘর। ছবির মত সুন্দর। এখানেও দারুণ আপ্যায়ন পেলাম।

দেখলাম আগের দিনের শিলাবৃষ্টি কী ক্ষতি করেছে ফসলের! একটা অলস সময় কাটানো, কিছু পাহাড়ি ফুলের ছবি তোলা, তারপর গল্প করতে করতেই সন্ধ্যা নামল। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া হল।

পরদিন সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট সেরে মুলকারখার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া আবার। এখানকার জঙ্গল আরো ঘন আর রাস্তা আরো চড়াই। তাই স্বাভাবিকভাবেই যাত্রাপথে বিরতির সংখ্যা এবং সময় দুটোই বাড়তে লাগল। পুরো রাস্তাটাই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হলেও মাঝেমাঝে দু-একটা করে ঘরবাড়ি চোখে পড়ছিল। বাড়িগুলো দেখে শুধু মনে হচ্ছিল এই পান্ডববর্জিত জায়গায় কী করে মানুষগুলো থাকে! কী যে এদের জীবিকা,কী করে সময় কাটে,ভেবে পাচ্ছিলাম না! এখানে প্রত্যেক বাড়ির সামনে ছোটখাটো চাষ হয়। এলাচ,পেঁয়াজ,ভুট্টা এইসব ফসল।বুঝলাম দিনআনা-দিনখাওয়া মানুষগুলোর চাষবাস আর সামান্য কিছু পশুপালনই রুটি-রুজি। প্রাণান্তকর চড়াই রাস্তায় ছয় কিলোমিটার হেঁটে মুলকারখা গ্রামে পৌঁছানো গেল। যদিও রাস্তাটা আমার কাছে ষাট কিলোমিটার মনে হয়েছিল!

মুলকারখা গ্রামটা ঠিক সাত থেকে দশটা বাড়ি নিয়ে। খুব সুন্দর গ্রাম। রাত্রে একটা ছোট বনফায়ার-এর ব্যবস্থা করা হল। গল্প করে, মুরগির রোস্ট খেয়ে কখন যে সময় কেটে গেল। ঘড়ির কাঁটাকে কে আর আটকাতে পারে! পরদিন সকালবেলা তিন কিলোমিটার হেঁটে মুলকারখা লেকের কাছে পৌঁছলাম। বড় বড় পাইনগাছে ঘেরা লেকটা হাল্কা ঠান্ডা হাওয়ায় আমাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতশ্রেণীর প্রতিবিম্ব দেখা যায় সরোবরের জলে। যদিও আমরা যখন পৌঁছলাম তখন আকাশের মুখ ভার। লেকের জলে চোখে পড়ল অন্য পাহাড়ের উপস্থিতি। এখানে নাকি যা মনস্কামনা করা যায় তাই পাওয়া যায়।স্থানীয় লোকেরা এটাকে মনোকামনা লেক বলে। ৭৩০০ ফিট উচ্চতায় এই লেক। শীতের বরফগলা জলই লেকের উৎস। লেক নিয়ে কিছু গল্পকথা আছে। যেমন লেকের জলে নাকি কোনো পাতা পড়ে না। পড়লেই পাখিরা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, পরিষ্কার রাখে লেকের জল।

লেকের ধার ধরে সারসার লাল-নীল-হলদে-সবুজ পতাকা। তাতে লেখা আছে শান্তির বাণী, হাওয়ায়-হাওয়ায় যা নাকি ছড়িয়ে যাবে পাহাড়ের আনাচে-কানাচে।

লেকের পাশে বসে থাকলে ঘড়ির কাঁটা সত্যি চলতে চায় না, তবু চলতে তো হয়ই। তাই ছবি তুলে আবার ফিরে চলা গ্রামের উদ্দেশ্যে। ব্রেকফাস্ট সেরে হাড়ভাঙা উৎরাই পেরিয়ে নামতে হল পিতামচেন গ্রাম পর্যন্ত। সেখান থেকে গাড়ি ধরে নেমে চলা রংপোর পথে। এবার যে ঘরে ফেরার গান গাইতে হবে।

কী দিয়ে গেলাম জানিনা। তবে অনেক কিছু নিয়ে গেলাম। ওই যে কী একটা কথা আছে না "LEAVE NOTHING BUT FOOTPRINTS AND TAKE NOTHING BUT MEMORIES"। চোখে ভরে নিয়ে গেলাম মুলকারখার সৌন্দর্য, সব কি আর ক্যামেরায় ধরা যায়! আর কী রেখে গেলাম? রেখে গেলাম মনের অনেকগুলো ইচ্ছে, তার মধ্যে যেমন একটা ছিল এখানে আবার ফিরে আসার কথা।

নেটওয়ার্ক ও সিকিউরিটি প্রফেশনাল গৌতম দে বর্তমানে লিনডে-তে কর্মরত। স্বল্পপরিচিত জায়গায় ঘুরে বেড়ানোটাই একটা নেশা। ভালোবাসেন ট্রেক করতে ও মোটরসাইকেলে করে ঘুরে বেড়াতে।

☆☆☆☆☆
কেমন লাগল : - select -
Like Sign Up to see what your friends like.
tell a Friend
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

মুকুটমণিপুরে

অংশুমান পাত্র

হাওড়া স্টেশন থেকে বাঁকুড়া প্রায় ২৩১ কিলোমিটার। আরামপ্রিয় যাত্রা করতে হলে ট্রেনে করে যাওয়াই শ্রেয়। বাঁকুড়ার একটি ছোট্ট শহর মুকুটমণিপুর। কিন্তু ছোট্ট এই শহরটি পর্যটকদের সম্মোহিত করে রাখে তার অভাবনীয় প্রকৃতির মাধুর্যে আর বিখ্যাত টেরাকোটার শিল্পকলায়। আমার এই ভ্রমণকাহিনি মুকুটমণিপুর বাঁধের পাড়ে বসে দিগন্তবিস্তৃত জলের কোলাহল উপভোগ করতে করতে লেখা।

বাঁকুড়া স্টেশন থেকে ৫৪ কিলোমিটার দূরে মুকুটমণিপুর। বাসে দিব্যি পাকা রাস্তায় বনশোভা উপভোগ করতে করতে পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে। সময়টা শীতকাল আর আত্মীয়ের বাড়ির সুবাদে থাকার সংস্থান হয়ে গেল। ঠিক করে নিলাম মুকুটমণিপুর ড্যাম আর সংলগ্ন অতি প্রাচীন অম্বিকানগর রাজবাড়ি পরিদর্শন করব। সকালে উঠে স্নান সেরে বেরিয়ে পড়লাম প্রথমে মুকুটমণিপুর ড্যামের উদ্দেশ্যে। আঁকাবাঁকা রাস্তায় পাখির কলতান শুনতে শুনতে পৌঁছে গেলাম একেবারে ড্যামের কাছে।

একপাশে গভীর পাথুরে খাদ অন্যপাশে নদীর একাংশ। যেতে যেতে প্রথমে কংসাবতী ভবন পড়ে, আর তারপর পাশে সার দিয়ে খাবারের দোকান। চেখে দেখতে পারেন গ্রামীণ খাবারের স্বাদ। মুকুটমণিপুর ঢোকার রাস্তায় সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে অনেকগুলো হোটেল হয়েছে। তবু ছুটির মরসুমে আগে থেকে হোটেল বুক করে রাখতে পারলে সুবিধা। কিছুটা এগোলে ড্যামের নিচে তৈরি হয়েছে নানা দোকান,টেরাকোটা সামগ্রী থেকে ঘরসাজানোর নানা উপকরণ সবই পেয়ে যাবেন এখানে। টেরাকোটার জিনিস বলতে বাঁকুড়াখ্যাত লালমাটির তৈরি হাতি ঘোড়া ইত্যাদি কী নেই! ড্যামের ওপরের রাস্তায় চেকপোস্টের কাছে আসতে চোখে পড়ল অনেকগুলি অটো আর মোটরচালিত গাড়ি যাকে ঠেলাগাড়ির এক অভিনব রূপান্তর বলা যেতেই পারে। অটোভাড়া তিন-চারশো টাকার মধ্যেই,আর মোটরচালিত গাড়ি নেবে দেড়শো থেকে দুশো টাকা, এতে আপনাকে সবকটি দর্শনীয় স্থান ঘুরিয়ে দেখাবে। প্রথমেই গাড়ি চলল সঙ্গমস্থলের উদ্দেশে - কুমারী আর কংসাবতী নদীর মিলন। নৌকায় করে পাঁচশো টাকায় সঙ্গমটি কাছ থেকে দেখবেন আর উপরি পাওনা ডিয়ার পার্ক। নদীর জলে সূর্যকিরণ পড়ে তার আলোকছটায় অপরূপ লাগছিল।

চললাম বিখ্যাত পরেশনাথ মন্দিরের দিকে। এই মন্দির নাকি হাজার বছরের পুরোনো,আগে ছিল অনেকটা নীচে সমতলে, কিন্তু প্রকৃতির খেয়ালে উঠে এসেছে ওপরে। সিঁড়ি পেরিয়ে ওপরে উঠে কথা হচ্ছিল মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে। প্রতিদিন তিনি অনেকটা পথ অতিক্রম করে আসেন দেবতার সেবায়। আহা প্রকৃতির কী অপরূপ শোভা! মন্দিরের কাছে এক বড় পাথরে উঠে দেখছিলাম একপাশে সুতোর মতো নদীটা আর অপরপ্রান্তে পাহাড় আর সবুজের সমারোহ। শীতের সূর্যের ঝলমলানিতে মনে হচ্ছিল আসাটা সত্যি সার্থক। মন্দিরের নিচে ছোটখাটো দোকান টুকিটাকি জিনিস কেনার জন্য।

এর পরের গন্তব্য মুসাফিরানা নেচার পার্ক - কয়েকবছর আগেই তৈরি হয়েছে পাহাড়ের ওপরে। পুরো মুসাফিরানার গায়ে চিত্রিত আর বর্ণিত হয়েছে বাঁকুড়ার দর্শনীয় স্থানগুলি। দশ টাকা প্রবেশমূল্য দিয়ে ঢুকে পড়লাম। ছাতার মতো বসার জায়গা আর সামনে বিস্তৃত নদী। এটি একটি থিম পার্ক, আনাচে কানাচে বাংলা হরফ ক খ গ-এর বাহার। পরিবার নিয়ে নির্জনে সময় কাটানোর এর থেকে ভালো জায়গা আর হয়না।

মুকুটমণিপুর দর্শন সেরে গাড়ি চলল অম্বিকানগরের উদ্দেশে। মাঝে গোড়াবাড়ি পেরোলেই অম্বিকানগর। নেমেই প্রথমে চললাম অম্বিকানগর মন্দিরের দিকে,মন্দির আর রাজবাড়ির ইতিবৃত্ত জানার কৌতূহল ছিল। মন্দির পরিদর্শনের পর হেঁটেই চললাম রাজবাড়ির উদ্দেশে। রাজবাড়ির সদস্যদের আমার আসার কারণ জানাতে তাঁরা আপ্যায়ন করে নিয়ে গেলেন সেই ঘরে যেখানে রয়েছে পুর্বপুরুষদের ছবি আর বংশলিপি। জানতে পারলাম এই বংশের দেবী মুকুটমণির নামানুসারে হয়েছে মুকুটমণিপুরের নাম আর দেবী অম্বিকার নামানুসারে তৈরী হয়েছে অম্বিকানগর। কেউ বিপ্লবী আবার কেউবা প্রখ্যাত কারুশিল্পী ছিলেন এই বংশে। আসল রাজবাড়ির অংশটা চাক্ষুষ দেখলাম, যদিও অনেকটাই ভঙ্গুর। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে এলাম।

ডঃ অংশুমান পাত্র রৌরকেল্লার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির মেটালার্জিকাল ও মেটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অধ্যাপনা করেন। অবসর সময়ে নেশা ভ্রমণ।

কেমন লাগল : - select -

Like Sign Up to see what your friends like.

tell a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher